KASH-PHOL

(A COLLECTION OF SHORT STORIES)

MEZBAH UDDIN JOWHER

PUBLISHED BY
Dewan Abdul Baset
Marupalash (Boipotro) GROUP OF PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH

ZONAL OFFICE
RIYADH
SAUDI ARABIA

FIRST EDITION
MARUPALASH GROUP
BANGLADESH
FEBRUARY 2002

2nd EDITION (INTERNET)
SHIPON
SEPTEMBER 2002

COMPUTER COMPOSE
LUBNA BASET BRISHTI

Contact with writer

E-MAIL: mezbahmezbah@hotmail.com

কাশ ফুল

মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের

(নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ)

প্রকাশক:

দেওয়ান আবদুল বাসেত

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে জাতীয় গ্রন্থ মেলা ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব

ইকবাল আহম্মেদ

দ্বিতীয় সংস্করণ (ইন্টারনেট)

শিপন

সেপ্টেম্বর ২০০২

কম্পিউটার কম্পোজ: লুবনা বাসেত বৃষ্টি

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স ঢাকা, বাংলাদেশ

জোনাল অফিসঃ রিয়াদ, সউদী আরব

Email: marupalash@yahoo.com

লেখকের কথা

কষ্ট ও সংগ্রামের কঠিন রসের সাথে দুএক ফোটা হাস্যরসের মিশেল দিয়ে বিধাতা জীবনতন্ত্র বুনেছেন, তাই জীবন এত মনোহর ।

লেখক পরিচিতি

গল্পকার মেজবাহ উদ্দিন জওহের ১৯৪৭ সালে গাজীপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা জীবনে পাকিস্তানের টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত ও পদার্থ বিদ্যায় মাষ্টার্স করেন। কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য জগৎ-এর প্রতি গভীর অনুরাগী। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সাহিত্যের বাঁকে বাঁকে ঘুরে বেড়িয়েছেন খোলা দৃষ্টি নিয়ে।

তিনি জীবনের গভীর উপলব্দির নির্যাসকে তুলে এনে ভাষার কারুকাজে ফুটিয়ে তুলেন গল্পের অবয়ব। তার গল্পে ছবি হয়ে ফুটে উঠে প্রাত্যহিক জীবনের নান্দনিক দর্শন। তিনি মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে বিচরণ করেন মমতা মিশানো শৈল্পিক অনুভূতি নিয়ে। তিনি বিমূর্ততার প্রাচীর ভেঙ্গে চরিত্রগুলোকে তুলে এনে মিশিয়ে দেন প্রাত্যহিক জীবনের চলমান স্রোতের সাথে।

তাইতো তার গল্পে চরিত্রগুলো মূর্তিমান হয়ে নিজেরাই কথা বলে। গল্পের পাশাপাশি রম্য-রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। রসবোধ প্রকাশে, বুনোনে তিনি একজন বাবুই পাখি। তার রস-রচনায় শৈপ্লিক ও শালীনতাবোধ বর্তমান। তাইতো তিনি এই বিভূঁই প্রবাসে এক বিশাল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা করেছেন একাধিক।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক
মরুপলাশ, মোহনা, রূপসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব।
সেপ্টেম্বর-২০০২

একটি কবিতার জন্ম

মায়িশা বেগম বড়ই মুশকিলে পড়ে গেছে। তার আলাভোলা স্বামীটির মাথায় কাব্যের ভূত চেপেছে। চল্লিশের পর সাধারণত কেউ কাব্যরোগে আক্রান্ত হয় না। মায়িশার পোড়া কপাল, নইলে এই ভাটি বয়সে কারও স্বামী কবি হতে চায়?

দিন কয়েক হলো ছোটবোন মালিহা বেড়াতে এসেছে। তার কাছে মনের ঝাপি খুলে বসে মায়িশা- বললে বিশ্বাস করবি না মিলি, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়াও করে না। সব সময় উড়ু উড়ু ভাব, ছেলেমেয়েগুলির দিকেও ফিরে চায় না ।

- তোমার কথাশুনে আমার ভয় লাগছে বুবু, দুলাভাই কারও প্রেমেপড়ে নাই তো ? শুনেছি প্রেমে পড়লে নাকি পুরুষ মানুষের মনে কাব্যভাব জাগে । মালিহার কণ্ঠে শংকা।

-ধ্যাৎ, সে সবকিছু না। আর যাই হোক তোর দুলাভাইর এসব দোষ নাই। কলেজ থেকেই কবিতার ভক্ত, জীবনে বড় কবি হবে আশা ছিল। সেই আশা পুরণ না হওয়াতে সবসময় মনমরা থাকে- সংসারে মন নাই ।

তা লেখলেই তো পারে। টাকা পয়সার অভাব নাই, বেকারের মতো টো টো করে না ঘুরে কবিতা লিখলে মন্দ কী

- হুঃ। বললেই কি আর কবিতা লেখা যায়? তোর দুলাভাই আমাকে সব বলেছে। কবিতা লেখা সহজ কাজ না, শক্ত শক্তকথা পেচিয়ে-পেচিয়ে খুব জটিলভাবে লিখলে তবেই আজকাল কবিতা হয়। কবিতা পড়ে যদি কেউ অর্থ বুঝতে পারে তাহলে সে কবিতা নাকি বাজারে বিকোয় না। তোর দুলাভাই নরম মানুষ, কঠিন ভাব ওর মাথায় খেলে না ।

- বলো কি বুবু মালিহার কণ্ঠে অকৃত্রিম বিস্ময়।

- ঠিক কথাই কইরে বোন। গত বছর একুশে তে কত কষ্ট করে একটা কবিতা লিখলো, আমাকে পড়ে শোনাল। তারপর হাসিমুখে সেই কবিতা নিয়ে বেরিয়ে গেল। যখন ফিরল, মুখটা চুন। মরার সম্পাদক। না ছাপাবি না ছাপা, উল্টাপাল্টা কথা বলে মানুষের মনে কষ্ট দেওয়ার কী দরকার- তুইই বল ?

-কবিতাটি তোমার মনে আছে, বুবু, শোনাও না।

- এত ছাইপাশ মনে রাখার কি সময় আছে রে বোন? সংসারের সমস্ত ঝামেলা আমার ঘাড়ে। তবে কবিতাটি আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল তো, তাই প্রথম দুই লাইন মনে আছে-

আজি এই দিনে ঝরে গেছে কতো রফিক শফিক জব্বার
খালি হয়ে গেছে কতো বুক কতো আম্মার কতো আব্বার ।

কবিতা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠে মালিহা। বলে- বাহ, চমৎকার মিল দিয়েছে তো দুলাভাই। জব্বারের সাথে আব্বার। এই জিনিষ, সম্পাদকরা ছাগল না? ভারী আশ্চর্য্য তো ।

-তুই-ই বল্ এখন....!

- না ছাপুক, তুমি দুলাভাইকে চালিয়ে যেতে বলো। সম্পাদকরা না ছাপে, তুমি নিজেই ছাপাও। তা ছাড়া কবিতা লেখার ভাল দিক আছে বুবু ।

- আর কোন দিক আছে আবার ?

- কবিতা লেখুয়া মানুষদের ভুড়ি হয় না, স্লিম থাকে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ মায় আমাদের শামসুর রাহমান তক্ কারও ভুড়ি নেই- লক্ষ্য করেছ? দুলাভাইর যা ফিগার এখনও কবি হওয়ার চান্স আছে। আর আমারটা! চল্লিশ পার হয় নাই এখনই টাব্বুশ একখান ভুড়ি বাগিয়েছে, আমি নাম দিয়েছি ভুড়িদাস ।

- দেব কষে এক থাপ্পর, ফাজিল কোথাকার। অনিক সোনার ছেলে, শুনলে মনে কষ্ট পাবে না ?

- ইস, খামোখা কষ্ট পেলেই হলো । হাসতে হাসতে বলে মালিহা। মোষের মত খায়, ভোস ভোস নাক ডাকায়। ডেবিট ক্রেডিট আর ব্যালান্স শিট ছাড়া মুখে কোন কথা নাই। আমিও অনিককে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি।

ঘোৎ ঘোৎ খায় ভাত ভুড়িদাস রায়
ভোস্ ভোস্ ডাকে নাক পিলে চমকায় ।

ছোট বোনকে মারতে উঠে মায়িশা। এমন সময় হতচ্ছাড়া একটা দাড়কাক কা কা শব্দ করে উড়ে এসে ছাদে বসল। মায়িশা বেগমের বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠে, তার হাতটা কেঁপে যায়।

(২)

কুমিল্লা-ঢাকা এক্সপ্রেস বাসগুলি বড়ই আরামদায়ক, মাত্র দুই ঘন্টায় ঢাকা পৌছে গেল। সায়েদাবাদ থেকে শ্যামলী। ঢাকার রাস্তাঘাটে দিনরাত যে গিটঠু লেগে থাকে এর মধ্যে স্কুটারে চেপে কালো ধোয়া পান করার পরিবর্তে বাস নেয়াই ভাল। সুতরাং গাবতলীর একটা বাসে ঢুকে পড়ে রায়হান। খুব সাবধানে জানালার পাশের একটা সিট দখল করল সে, পকেটে একরাশ টাকা। চোর বাটপারের অভাব নাই, সামনের চোরা পকেটে রক্ষিত টাকাগুলির অস্তিত্ব অনুভব করে সে। একটু সাবধানে চলাফেরা করতে পারলে রিক্সা-স্কুটারের চাইতে বাস জার্নিই নিরাপদ- ভাবল রায়হান।

রায়হানের পাশে বসা বৃদ্ধ লোকটি বার বার চেপে আসে তার দিকে, শরীরের উপর চাপ পড়ে। লোকটির মুখের দিকে চায় রায়হান, মুখে একমুষ্টি পাকা দাড়ি-সৌম্য শান্ত চেহারা। পূণ্যশ্লোক। হঠাৎ করে পুণ্যশ্লোক শব্দটি মনে পড়ল রায়হানের। আচ্ছা, পুণ্যশ্লোক শব্দের মানেটা যেন কী? পুণ্য- যাকে বলে গিয়ে পুণ্য-মানে ছোয়াব। আর শ্লোক শব্দের অর্থ হচ্ছে শোলোক-মানে স্তোত্র। তাহলে পুণ্যশ্লোক শব্দের অর্থ দাঁড়াল-পবিত্র স্তোত্র।

পবিত্র বাক্যও বলা যায়। কিন্তু লোকের নামের আগে পুণ্যশ্লোক লেখা হয় কেন? পুণ্যশ্লোক দানবীর হাজি মোহাম্মদ মহসিন! বিষয়টা কি? তার পাশে বসা লোকটি কি কোন পুণ্য-আত্মা-*ডিভাইন সোল?* নইলে এই বিচ্ছিরি সময়ে ঘামে-গরমে শালা বাঞ্চোত শব্দের পরিবর্তে পুণ্যশ্লোক শব্দ মনে এলো কেন?

আড়চোখে সেদিকে তাকায় রায়হান। লোকটি একটি রুমাল দিয়ে বাতাস খাচ্ছে। যা গরম, বুড়ো লোকদের জন্যে এরকম ঠাসাঠাসি বাসে চড়া প্রায়শ্চিত্তেরই নামান্তর, তা বাবা তুমি যতোই, পুণ্যবান পুরুষ হও না কেন। এর মধ্যে এক ছোকড়া আবার ওষুধ বিক্রি শুরু করলো। চ্যাবনপ্রাস। স্বপ্নপ্রাপ্ত অলৌকিক চ্যাবনপ্রাস এটি, যেই সেই ওষুধ না। খুব মনোযোগ দিয়ে ছেলেটির বয়ান শুনে যায় রায়হান। কুমিল্লার পলাশপুর গ্রামের বিখ্যাত ননীগোপাল কবিরাজের স্বর্গীয় ঠাকুর্দা স্বপ্নে এই ওষুধটি পেয়েছিলেন। তিনি এবং তার উত্তরপুরুষরা গত একশ বছর ধরে এর সাহায্যে মানুষের উপকার করে যাচ্ছেন। দাম নামমাত্র, অথচ এমন কোন অসুখ নাই এই ওষুধে ভাল হয় না। শেতিপ্রদর, মেহ-প্রমেহ, গনোরিয়া-সিফলিস, কলেরা-বসন্ত, ডায়াবেটিস-ব্লাড-প্রেসার মায় হাপানি কাশি পর্যন্ত এর এক ডোজ খেলে ভাল হয়ে যায়, বৃদ্ধ নবযৌবন ফিরে পায়। ছেলেটি অক্লান্তভাবে এই আশ্চর্য ওষুধটির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে, অথচ কারও কেনার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বাসের এতগুলি লোকের মধ্যে একজন লোকও এইসব রোগের কোন একটিতে ভুগছে না, একি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

ক্যানভাসার ছেলেটির জন্যে মায়া হলো রায়হানের। তবে ছেলেটির মুখে হতাশার কোন চিহ্ন নাই। সে এখন কালো কালো বড়িগুলি কাগজের উপর দিয়ে লোকদের কাছে বিনা পয়সার বিলাচ্ছে। পয়সা না দিক, বিনাপয়সায়ই লোকজন তার ওষুধটা একবার পরখ করে দেখুক। রায়হান আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল বিনা পয়সার ওষুধ খেতেও মানুষের অনীহা। দশজনের ভেতর দুজন লোকও হাত বাড়িয়ে সেই ওষুধ নিল কিনা সন্দেহ আছে।

ছেলেটি এক পুরিয়া চ্যাবনপ্রাস রায়হানের সামনে বাড়িয়ে ধরল, এমনিতে রাস্তাঘাটে কোথাও এক গ্লাস পানি পর্যন্ত খায় না রায়হান- বড়ই স্বাস্থ্য-সচেতন সে। আজ বেশ আগ্রহ করেই ছেলেটির হাত হতে ওষুধ নিয়ে নিল সে। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি থাকবে না তা হয় না।

বেশ মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ ওষুধটির, এবং ঝাঁজালো। ভালো ওষুধ একটু ঝাঁজালো হয়ই। দেখা যাক- যদি উপকার বুঝা যায় তাহলে পরবর্তীতে পুরো এক ফাইল ওষুধ কিনতে হবে। জন্ম-আমাশয়ের রোগী রায়হান। বাসে চাপলে সব সময়ই ঘুম পায় রায়হানের। আজ যেন একটু বেশী বেশী পাচ্ছে। চোখ ভারী হয়ে আসছে, চেষ্টা করেও দু চোখ খোলা রাখা যাচ্ছে না। সামনের সিটে মাথা ঠেকান দিয়ে মিনিট কয়েক ঘুমিয়ে নেয়া যায়, মাথাটা হাল্কা হবে। পকেটে পঁচিশ হাজার টাকা, তবে টাকাগুলো এমনভাবে রাখা আছে যে তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে কেটে টাকাগুলি বের করে নেয়া অসম্ভব। সুতরাং নিশ্চিতমনে সামনের সিটে মাথা ঠেকালো রায়হান।

এই যা, বেশ তোফা এক পশলা ঘুম হয়েছে যাহোক! চোখ খুলল রায়হান। কিন্তু একি, মাথাটা এত হালকা লাগছে কেন? মাথা কি মাথার জায়গায় আছে? কষ্ট করে আশে-পাশে তাকিয়ে জমে বরফ হয়ে যায় রায়হান। সে কোথায়? তার চারপাশে সারি সারি বেড, সেকি কোন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে!

বহু কষ্ট করে উঠে বসল রায়হান, মাথাটা সোজা রাখা যাচ্ছে না। এটা নির্ঘাত হাসপাতাল, কিন্তু সে হাসপাতালে কেন? কীভাবে এখানে এল সে? তার বাসা শ্যামলীতে, পাওনা টাকা আদায় করতে সে কুমিল্লা গিয়েছিল। টাকা নিয়ে গাবতলীর বাসে উঠেছিল। তারপর? তারপরের ঘটনা কিছুই মনে পড়ছে না তার।

পোষাকের দিকে তাকাতেই আর এক পশলা হোচট খায় রায়হান। পরনে কমদামী একটা লুংগী, গায়ে গেঞ্জী। তার জামা কই, প্যান্ট কই, ক্লার্কসের দামী সু জোড়া কই? ব্রীফকেসটা কই? পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে রায়হান। সে যদি হাসপাতালেই এসে থাকে তার বাড়ির লোকজন কি খবর জানে? শ্যামলী কোনদিকে, সে কি চিনে যেতে পারবে সেখানে?

মাথাটা মোটেও কাজ করছে না, গায়ে একরত্তি শক্তি নাই, চোখ আবারও মুদে আসছে। কোনমতে উঠে বসার চেষ্টা করলো, টলোমলো পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মান্ডটা দুলে উঠল যেন। ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়ে রায়হান।

কমবয়েসী একজন মেয়েলোক এগিয়ে আসে তারদিকে, নিম্নশ্রেণীর মেয়েলোক হয়তো আয়াটায়ার কাজ করে এখানে। রায়হানকে জিজ্ঞেস করে- ভাই আপনের বাড়ি কই? তিনদিন ধইরা হাসপাতালে পইরা আছেন কেউ দেকপার আইল না!

সে তাহলে তিনদিন ধরে হাসপাতালে পড়ে আছে! তার মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে সে একটা বাসের মধ্যে ছিল, চ্যাবনপ্রাস খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে তিনদিন কেটে গেছে! হাসপাতালেই বা সে কীভাবে এলো, কে রেখে গেল? নাহ্, কিছুই মনে পড়ছে না, মাথাটা কাজ করছে না মোটেও।

রায়হান বললো- এটা কোন হাসপাতাল?

-ঢাকা মেডিকেল-। মেয়েটি বলল, আপনার বাড়ি কই ভাইসাব? বাড়িতে সংবাদ দেওনের দরকার অইলে বলেন, আমি গিয়া খবর দিয়া আহুমনে।

-আমার বাসা শ্যামলীতে। তুমি আমার একটু উপকার করবে, একটা রিক্সা ডেকে দেবে?

-কী যে বলেন ভাই, চলেন আমি নিজে গিয়া আপনারে দিয়া আহি। এই অবস্থায় আপনে একা একা যাইতে পারবেন না। বাসা চিনবার পারবেন তো?

(৩)

ঝুল বারন্দায় ইজি চেয়ারের উপর চুপচাপ বসেছিল রায়হান। সেদিকে তাকাতেই মায়িশার বুকের ভিতর ধক্ করে উঠল। সেদিন যখন অপরিচিতা এক মহিলার হাত ধরে টলমল পায়ে বাসার গেট দিয়ে ঢুকলো রায়হান, মায়িশার হার্টফেল করার জো। কী বেশবাশ! খালি পা, ঠেলাওয়ালাদের মতো লুংগী, তিনদিনের না কামানো খোচাখোচা দাড়ি, চোখ দুটি যেন মরা মানুষের চোখ।

এই সাতদিনে প্রায় সেরে উঠেছে রায়হান, মুখের বিভ্রান্ত ভাবটা কেটে গেছে, চোখে মুখে জীবনের সতেজতা ফিরে এসেছে। রায়হানের পাশে যেয়ে দাঁড়ালো মায়িশা, মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল- কী ভাবছ?

-বসো এখানটায়। কতো কি ভাবি, ভাবনার কি শেষ আছে? কঠিন এক সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। নষ্ট সময়- আশেপাশের কাউকে বিশ্বাস করার জো নাই। জান, বাসের সেই ক্যানভাসার ছেলেটার জন্যে সত্যি খুব মায়া হয়েছিল আমার। পাশের লোকটাকে মনে হয়েছিল ধীর-স্থির সৌম্য-শান্ত এক বৃদ্ধ। অথচ কিছুক্ষণ পরেই তারা আমাকে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলল, একটু দ্বিধা করল না। আমি তো মরেও যেতে পারতাম। মানুষের জীবনের কি এতটুকু দাম নাই?

মায়িশা দরদভরা কণ্ঠে বলল- ওরা কি মানুষ যে অন্যের জানের মায়া করবে? ওরা পশুরও অধম। অথচ পাশাপাশি সেই মেয়েটির কথা ভাব। একজন অপরিচিত বিপদগ্রস্থ মানুষ দেখে নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। পাঁচশ টাকার নোট হাতে গুজে দিলাম, কিছুতেই নিল না। বলে- ভাইসাবকে দেখতে ঠিক আমার এক চাচার মতো আফা, তার সামান্য এই কামটুকু কইরা পয়সা নিমু!

-ঠিক বলেছো মায়া, সাপ-বাঘের অরণ্যে আজও দু চারটা দোয়েল শ্যামা টিকে আছে, গান গায় শিষ দ্যায়। এইবার বুঝতে পেরেছি কেন আমার কবিতা সম্পাদকরা ফিরিয়ে দেয়। যে কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তার ছন্দকে যুগযন্ত্রনাকে আমি ছুঁতে পারি নাই। প্রত্যেক সময়ের একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, ভাষা আছে। আশেপাশের আবহ কবির হাতে সেই ভাষা তুলে দেয়। আমার কবিতায় আমি সময়কে ধরতে চেষ্টা করি না, খালি মিল খুঁজে বেড়াই। এইবার আমার চোখ খুলেছে, এই দ্যাখ আজই একটা কবিতা লিখে ফেললাম-

পল্টনের মোড় এখন গহীন অরণ্য
নিরেট শক্ত বৃক্ষগুলি মহীরুহ, উন্নতশীর-
আকাশটাকে ছুঁয়ে দেবে তারা দুঃসহ স্পর্ধায়।
অরণ্যের অন্ধকারে শ্বাপদদের নির্ভয় বিচরণ
গর্জন, কামার্ত শীৎকার
পাতায় পাতায় চেয়ে আছে বৈদূর্য্যমনি
হিংস্র অজগরের শীতল চোখ হয়ে।
হঠাৎ একটি দোয়েল উড়ে এসে
শিষ দ্যায় গাছের শিয়রে
কিবাশ্চর্য্যম-
ধলেশ্বরী নদী বয়ে যায়
তাল তমালের ছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
শ্যামলা রংয়ের মেয়েটি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বেলা অবেলায়

রাখাল বাজায় তার অলৌকিক বাঁশি-
অনন্ত গোধূলি লগ্নে সেই সুর বাজে অনুক্ষণ
অরণ্যানী ধ্বংস হোক বেঁচে থাক প্রেম চিরন্তন।

স্বামীর কবিতা শুনে মায়িশা বেগম বেজায় খুশি। কবিতাটি সে এক বর্ণও বুঝতে পারেনি, সুতরাং তার স্বামী যে একজন কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই!!

একটি অশালীন গল্প

সূচনা

বাংলাদেশের অফিস আদালতে কাজ-কাম কিছু হয় না- সকলের এইরূপ বিশ্বাস। এমনকি বউও এই তত্ত্বে দারুনভাবে বিশ্বাসী। আমার অফিসটা যে এর সম্পূর্ণ বিপরীত, এই সত্যকথাটা তাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। ছোট শালী একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, আমি তার লোকাল গার্জিয়ান। সপ্তাহে সপ্তাহে তার খোঁজখবর নেয়ার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। অথচ গত এক মাস যাবৎ তার শ্রীমুখের দর্শন হয় নাই। এ নিয়ে সংসারে প্রচন্ড নিম্নচাপ। যে অফিস মাসে একটা আঁধলা পর্যন্ত উপরি পয়সা দিতে পারে না-সেই ছাতার অফিসে কোনকামে আমি রাত আটটা পর্যন্ত পড়ে থাকি এই সন্দেহে গিন্নি দিনরাত ঘুরপাক খান। আমার চাকরিটা রেডিওর হলেও আমাদের অফিসটা যে মেয়েমানুষের অভাবে মরুভুমির মতো খা-খা করছে, এই কথা তার মাথায় আজও ঢোকানো গেল না- বড়ই আফশোস্।

আজ কোন এক ফাঁকে রেখার ওখানে যেতেই হবে, নইলে বাসায় ফিরলে কালবোশেখী ঝড়ের সাথে যে প্রচন্ড বারিবর্ষন শুরু হবে, তা মোকাবেলা করার মতো বুকের পাটা আমার নাই। জাপানী টিমটাকে বিদায় দিয়ে উঠবো ভাবছি, এমন সময় পিয়ন আইজুদ্দি রুমে ঢুকল। পেশায় সামান্য একজন পিওন হলেও আইজুদ্দির মুখে সবসময় একজন বিদগ্ধ দার্শনিকের গাম্ভীর্য লেগে থাকে। ঢাকা শহরে যারা চলাচল করেন, হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে রাস্তার পাশে মাঝে মধ্যে একটা কৌতুহলোদ্দীপক চিকা মারা আছে- কষ্টে আছি, আইজুদ্দি, কয়কীর্তন। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই অদ্ভুত চিকা মেরেছে অনেক ভেবেও তা বার করতে পারি নাই। আইজুদ্দিকে পিয়ন হিসেবে পাওয়ার পর আশা করলাম এই সমস্যার একটা সুরাহা হয়তো হলো। ওর মুখচোপা যেরকম বিদগ্ধ দার্শনিকতায় ঠাসা, তাতে ওর দ্বারা এই চিকা মারার কাজটি হলে হতেও পারে। কিন্তু পার্সোনাল ফাইলে লেখা আছে- ওর গ্রামের বাড়ি কুঁয়াকাটা, কয়কীর্তন নয়- এখানেই কেবল একটু সন্দেহ রয়ে গেছে।

আইজুদ্দি বলল- একজন মাইয়া মানুষ অনেকক্ষণ ধইরা বইসা আছে, ডাকুম?
- মাইয়া মানুষ! কোত্থেকে এসেছে, কী চায়?
- কী চায় তা সে নাকি আপনেরেই কইব। বাড়ি ধামরাই, নাম বলল রিজিয়া বেগম।

রিজিয়া বেগম! ইতিহাসের বাইরে এমন একটা নামের সাথে আমার পরিচয় আছে বলে মনে হলো না। মেয়েলোকটিকে আসতে বললাম। কিছুক্ষণ পর যে মেয়েলোকটি অফিসে ঢুকলো তাকে দেখে দারুনভাবে চমকে উঠি আমি। রিজিয়া কোথায়, এতো কাঞ্চী! পনের বছরে চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু এই মুখ একবার দেখলে কি ভুলা যায়? মুহুর্তেই অতীতে চলে যাই আমি।

এয়াকুব নবীর বয়ানী

ইউনিভার্সিটির মোটা মোটা বই সাঙ্গ করে কর্মক্ষেত্রে ঢোকার পর প্রথম প্রথম মাথা একদম আউলা হয়ে যায়, বইপুস্তকের সাথে বিস্তর ফারাক। বইয়ের পৃষ্ঠার ছোট ছোট দুইটি সমান্তরাল রেখার সাহায্যে একটি ক্যাপাসিটর বুঝানো হয়েছে, অথচ চাররিতে ঢুকে দেখি- ক্যাপাসিটর তো না যেন এক একটি কামান। একদিন পাওয়ার ভল্টে ঢুকে কৌতুহলবশতঃ যেই না একটা ক্যাপাসিটরের গায়ে হাত দিতে গেছি, পেছন থেকে রাম ধাক্কা। সামলে নিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি- এয়াকুব নবী, অফিসের সিনিয়র মেকানিক। আমার বিস্ময়ের জবাবে সে বলল- হাই ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর, পাওয়ার অফ থাকলেও কয়েক ঘন্টা চার্জ ধইরা রাখতে পারে। ডিচার্জ না কইরা এগুলি ধরতে আছে? আপনেও মরবেন, আমাগোও মারবেন। বলে দরজার সাথে আটকানো একটা আর্থিং রড খুলে ক্যাপাসিটরগুলিতে ছোঁয়ায় নবী। অবাক কান্ড! ছোঁয়নোমাত্র সেখান হতে যে জোরে চোখ ধাঁধাঁনো ফ্লাশ হতে থাকল তা আমার গায়ে লাগলে চাঁদি নির্ঘাত ফুটো হয়ে যেত। ভাগ্যিস এয়াকুব নবী ছিল, নইলে সেই ফুটো দিয়ে এতক্ষনে আমার পৈতৃক প্রানটাও যে সুরুৎ করে বেরিয়ে নীল আকাশে পাখা মেলত- তাতে কোন সন্দেহ নাই। এয়াকুব নবী মাথায় লম্বা হালকা পাতলা একজন লোক। সব সময়ই হাসি খুশি। একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষও যে শুধমাত্র অভিজ্ঞতার বলে কাজকর্মে কতটুকু এক্সপার্ট হতে পারে, এয়াকুব নবীকে না দেখলে তা বিশ্বাস করা মুশকিল হতো। বিশলাখ টাকা দামের জটিলতম রিলের অতিসূক্ষ্ম স্প্রিং এডজাষ্ট করতে হবে। কে করবে- না এয়াকুব নবী। কন্ট্রোল সার্কিটের ভেতরে এমন জায়গায় ঘাপলা বেঁধেছে যে সেখানে সুঁইও ঢুকে না-সবাই কুপোকাৎ। তবে বড়সাব মোটেই ঘাবড়ান না-এয়াকুব নবী আছে। তার হাতের কাজ এমন যে মনে হয়- যন্ত্রের গায়ে না নতুন বউয়ের গায়ে আদর করে হাত বুলাচ্ছে সে। কাজ শেষে যন্ত্র চালু করে নবী যখন পেছন ফিরল তখন রাত আটটা। শরীরে প্রচুর ধুলা ময়লা, মুখে সাফল্যের হাসি। নুরুল হক এগিয়ে এসে বলল- ওস্তাদ, দশ ঘন্টা পার হইয়া গেছে, খিদায় বাঁচি না।

নবী বলে- ক্ষুধা তো লাগবেই। কাওয়ালি গা, ক্ষুধা দূর হইয়া যাইব ।

ওস্তাদ আইজ আপনে গান, আমার গলায় জোর নাই ।

ব্যাস। কাপড় চোপড়ের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে নবী শুধু করে-

জো কুছ মাংনা হ্যায় দরে মোস্তফা ছে মাং

আউর, উছ ছে জেয়াদা মাংনা হ্যায় তো আজম ছে মাং

আজম ছে মাং।

নবীর সাথে এবার হারেজ আলী রহি মোল্লারাও গলা মেলায়। সেই অপরূপ কাওয়ালির গর্জন যন্ত্রের আওয়াজ ছাপিয়ে সমস্ত অফিসকে মুখর করে তুলছে। আমি বেকুরের মত পাশে দাঁড়িয়ে। অফিসের বড় কর্তার নাম আজম, ছোট কর্তার নাম মোস্তফা। শব্দের ঠেলায় উভয়েই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। নবীদের কাওয়ালি তখন তুঙ্গে- সবাই চোখ বুজে বিপুলস্বরে চেচাচ্ছে- আজম ছে মাং, আজম ছে মাং । শব্দে অফিসের ছাদ ভেংগে পড়ার জো।

আজম সাহেব হাসতে হাসতে বললেন- এই হারামজাদা থাম্‌লি। এটা সরকারি অফিস না? মোস্তফা দ্যান তো, না দিলে হারামজাদারে থামান যাবে না ।

সুতরাং টাকা নিয়ে তক্ষুনি একজন চৌরাস্তায় দৌড়ায়, নবীর কল্যানে সকলের বরাতে হাইওয়ে রেস্তোরার উৎকৃষ্ট বিরিয়ানি জুটে।

সেবার ঈদে ছুটি মিলল না । ইমারজেন্সী ডিউটির ফাঁদে আটকা পড়ে ইঁদুর বনে গেলাম । মনটাকে চাংগা করতে গ্রামের দিকে হাটতে বেরিয়েছি, দেখি নবী কোমর বেঁধে কোদাল চালাচ্ছে- পাশে উঠতি বয়সের এক ছেলে। বড়ই মায়াদারি চেহারা। আমাকে দেখে নবীর কোদাল থেমে গেল। চেঁচিয়ে বলল- আরিব্বাপ, কী সৌভাগ্যি আমার। গরীবের বাড়িত হাত্‌তির পারা। তারপর পাশে দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে খেকিয়ে উঠল- এ্যাই হারামজাদা, এখানে খারাইয়া হা কইরা কী দেখছস? শিগ্‌গীর যা, চেয়ার নিয়া আয়। তর বাপ-দাদার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি- এমুন মানুষ একলা একলা আমাগো বাড়িত আইছে।

ছেলেটি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যায়। ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে খুব খারাপ লাগে আমার, বলি- ছেলেটি কে নবী মিয়া?

-আল্লার মাল আমার বড় পোলা স্যার। ইস্কুল পাশ দিয়া এইবার কলেজে ঢুকল।

- আমি আশ্চর্য হয়ে বলি- কলেজে পড়ে সেই ছেলেকে আপনি এইভাবে গালাগালি দিলেন!

নবী ততোধিক আশ্চর্য হয়ে বলে- গালাগালি দিলাম!

- গালাগালি না? হারামজাদা, তর চৌদ্দগুষ্টি-কতকিছু বললেন।

আমার কথায় হেসে ফেলে নবী। হাসতে হাসতে বলে- স্যার, আপনের কথায় একটা গল্প মনে পইরা গেল। পিন্ডিতে চাকরি করবার সময় শুনছিলাম। বেয়াদপি না নেন তো গল্পটা আপনারে শুনাই।

- বেশতো বলেন.....আমি আগ্রহ সহকারে বলি।
-পিন্ডিতে আমাদের রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন হানিফ সাব-পাঞ্জাবী। খুবই কেতাদুরস্ত অফিসার আছিলেন তিনি। তার চাপরাশী ফুলশা হাজারা জেলার লোক। আমার মতই মূর্খ, তবে খুব মজা করতে পারত। প্রথম যেদিন ফুলশা হানিফ সাবের বাসায় গেল, হানিফ সাব খুব তাজিমের সাথে বলল-আইয়ে আইয়ে বৈঠিয়ে। ইয়ে মেরা বৈঠকখানা হ্যায়। বড়সাবের সামনে ফুলশা কি বসতে পারে, লজ্জায় দাঁড়াইয়া থাকে সে। এমন সময় হানিফ সাবের ছেলে আসে সেখানে। হানিফ সাব ছেলের সাথে ফুলশার পরিচয় করাইয়া দেয়-ইয়ে মেরা সাহেবজাদা হ্যায়।
এই ঘটনার পর কোন কারনে একদিন হানিফ সাব ফুলশার বাড়িতে গেছেন। সাহেবকে নিজের বাড়িতে পাইয়া ফুলশা দারুন খুশি- বৈঠকখানায় নিয়া গিয়া বলে-আইয়ে সাব তশরিফ লিজিয়ে, ইয়ে মেরা পায়খানা হ্যায়। ফুলশার কথায় অপ্রস্তুত হন হানিফ সাব, তবে মুখে কিছু বলেন না। কিছুক্ষণ পর ফুলশার ছেলে সেই ঘরে ফুচ্‌কি দিল। ফুলশা বলে- আও বেটা আও, চাচাজীকে ছালাম দো। সাব, ইয়ে মেরা হারামজাদা হ্যায়।
হানিফ সাব আর চুপ করে থাকতে পারে না- জোর ধমক মারেন- এসব কী অসভ্যের মত কথাবার্তা হইতেছে ফুলশা-পায়খানা, হারামজাদা.....?
ফুলশা বিনয়ের সাথে বলে-সাব আপ্ অপ্সার হ্যায়, ম্যায় আপকো চাপরাশী হো। আপকা দহলিজ বৈঠকখানা হোনেছে চাপরাশীকা দহলিজ পায়খানাছে জেয়াদা ক্যা হো ছাকতা । আউর আপকা লেড়কা সাহেবজাদা হ্যায় তো মেরা লেড়কা হারামজাদাছে জেয়াদা ক্যা হো ছাকতা?
সব্বাস্ এয়কুব নবী , গল্পটা বানানো হলেও ওর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারি না। কী সুন্দরভাবে আমার কথা আমাকেই ফিরিয়ে দিল! ছোট্ট একটা চাকরি, বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে গোটা সাতেক খানেওয়ালা। অথচ ওর চারপাশে আনন্দ যেন শত ধারায় উপছে পড়ছে। যেখানে নবী সেখানেই হাসি, যেখানে নবী সেখানেই খুশির হিল্লোল। এই জন্যেই এত ভালবাসি ওকে আমি।

কাননবালা দাসী

সেদিন অফিসে ঢুকতেই এক অপরূপ দৃশ্য। কার পার্কিংয়ে একটা মেয়ে ঝাট্ দিচ্ছে, অফিসের তাবৎ তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীরা ভীড় করে দেখছে। ব্যাপারটা কি? আমাকে দেখে সবাই চটপট কেটে পড়ল, শুধু মেয়েটি সপ্রতিভভাবে বলল- সেলাম বাবু ।
মেয়েটির দিকে তাকাতেই জোর ধাক্কা খেলাম আমি, একটা হার্টবিট মিস্ হয়ে গেল যেন। ষোল সতের বছরের মেয়েটি কচি পাতার মত গায়ের রং। সারা শরীরে লাবন্যের ঢল নেমেছে। ছাপা রংয়ের একটি শাড়ি এমন কায়দায় গায়ের সঙ্গে পেচিয়ে আছে যে ভয় হয়

এই বুঝি তা খসে পড়ল। ক্ষীণ কটি গুরু নিতম্ব বলে একটা কথা চালু আছে-মেয়েটি তার দেহের ভাষায় সেই কথার সত্যতা প্রমান করতে উদ্যত। দুটি সুডোল বাতাবীলেবু কমলা রংয়ের ব্লাউজের ভেতর থেকে তাদের কমনীয় অস্তিত্বের আভাষ দিচ্ছে। মাথাভর্তি অকৃপন চুল চুড় করে বাঁধা, সেখানে গোটাকয়েক টাটকা গোলাপ ফুল বৃন্তচ্যুত হয়ে তাদের পুস্পজন্মের স্বার্থকতা লাভ করেছে। চোখ দুটি বিদ্যুতে ঠাসা, চোখে চোখ পড়লে গায়ে শিহরণ খেলে যায়। বাৎসায়নের কামশাস্ত্রের নারীটি মূর্তি ধরে অফিসে হাজির হলো নাকি? নজরুলের কবিতা মগজের মধ্যে ঢেউ খেলে যায়-

সুন্দরী বসুমতি
চির-যৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয় কাম রতি।

মেয়েটির নাম কাননবালা দাসী, ডাকনাম কাঞ্চী। মনোহর দাস ছিল অফিসের ঝাড়ুদার, কাঞ্চী তারই মেয়ে। মনোহর মারা গেলে তার ফ্যামিলির প্রতি দয়া করে তার মেয়েকে চাকরি দেয়া হয়েছে। খোদ্ হেড অফিসের এ্যাপয়েন্টমেন্ট- ট্যা ফো করার জো নাই। হেড অফিস তো নিয়োগ দিয়েই খালাস, এখন তার ঝক্কি সামলায় কে? এক রত্তি একটা মেয়ে সারা অফিসে যেন ঝড় তুলে ছাড়ল। কাঞ্চীর মন জয় করার জন্যে নিচের দিকের কর্মচারীদের মধ্যে দস্তুরমত প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে গেল। আবদুল্লাহ চা নিয়ে আসে তো আমির আলী ডাবল পান। সামাদ নেতা গোছের মানুষ, বড়ই রাশভারী। সে কখনও নীচু গলায় কথা বলেছে এমন দূর্ণাম তার শত্রুরাও দিতে পারবে না। সেই দুর্দন্ডপ্রতাপ সামাদ পর্যন্ত কাঞ্চীর সাথে কেমন মিঠা মিঠা কথা বলে। এই ঘটনা থেকেই অফিসের বর্তমান অবস্থাটি জরীপ করা যেতে পারে।

সেদিন এক বোরকা-পরা মহিলা এসে বড় সাহেবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল। মুহুর্তেই চাপা গুঞ্জনে অফিস ছেয়ে গেল-এয়াকুব নবীর বউ। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার জানতে পেরে সকলে হতভম্ব! আমাদের এয়াকুব নবী নাকি জবাই হয়ে গেছে, একেবারে দিওয়ানা। সংসার-ছেলেমেয়ে সব ফেলে সে এখন কাঞ্চীর প্রেমে পাগল। ঘটনা তলে তলে এতদূর গড়িয়েছে কেউ কল্পনাও করতে পারে নাই। নবী সর্বজনপ্রিয় ফিগার, তার ক্ষতি হোক এটা কেউ চায় না। সুতরাং সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মনোহর দাসের মেয়ের উপর। কাঞ্চীর প্রেমিকদের সবার টপে ছিল আমির আলী। সে এই নষ্টামির বিরুদ্ধে রীতিমতো জেহাদ ঘোষনা করে বসল। কখন কী ঘটে যায় এই ভয়ে আমরা সবাই তটস্থ। বেগতিক দেখে বড়সাব নবীকে সিলেট বদলি করে দিলেন। যা বাবা, দূরে গিয়ে ইচ্ছামত চড়ে খা। বড়সাব সেকেলে লোক, আউট অফ সাইট হলে আউট অফ মাইন্ড হবে- এইরূপ ছিল তার বিশ্বাস। নবীর অনুপস্থিতিতে আমির আলি কিংবা অনিল ঘোষের মতো ছোকরারা যদি একটু এ্যাকটিভ হয় তাহলে কাঞ্চীর মন নবীর দিক থেকে সরে যেতে কতক্ষণ? নবীর পরিবারটি তাহলে রক্ষা পায়।

রিজিয়া বেগমের ছেলে

পাঠকবর্গ হয়তো অনুমান করতে পেরেছেন যে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। এয়াকুব নবীর পরিবার রক্ষা পেয়েছিল- তবে একটু ভিন্নভাবে। আমির আলী ও অনিল কর্মকার বহু চেষ্টা করেও কাঞ্চীর মন জয় করতে পারে নাই। নবীর বদলির ছয় মাসের মাথায় কাঞ্চী নিখোঁজ হয়। পরে খোঁজ পাওয়া যায়-নবী কাঞ্চী টিলাগড়ের এক নিভৃত কন্দরে সুখের ঘরকন্না পেতেছে। তাদের ভালবাসা বেহিসেবী হলেও বিবেকহীন ছিল না। দুজনের রোজগারে নবীর পরিবার বরং আগের চেয়েও স্বচ্ছলভাবে দিনাতিপাত করতে থাকে। তবে নিরবিচ্ছিন্ন ভালবাসা বিধাতার চোখের কাঁটা। এয়াকুব নবীর অভিজ্ঞ সতর্কতায় চাকরীজীবনের প্রথমে এক অবধারিত দূর্ঘটনার হাত থেকে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম, কিন্তু তার নিজের বেলায় এয়াকুব নবীকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। ট্রান্সমিটারে কাজ করার সময় আকস্মিক হাই ভোল্টেজ শকে নবীর জীবনান্ত হয়। নবী-কাঞ্চীর প্রেম-কাহিনীর সেখানেই ইতি।

আমার সামনে আজ রিজিয়া বেগম নামের যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে, সন্দেহ নাই সে পনের বছর আগেকার কাঞ্চী নামের এক ষোড়শীর ধ্বংসাবশেষ। সে আজ আমাকে সেলাম বাবু বলে অভিবাদন করল না। ক্লান্তকণ্ঠে বলল- *আর পারতেছি না স্যার, আমার এই ছেলেটারে আপনার পায়ে ঠাই দিয়া আমারে বাঁচান।*

অনেকদিনের কথা হলেও কাঞ্চীর ছেলেকে চিনতে পারি আমি এয়াকুব নবীর সেই হারামজাদা

কাঁশফুলের কাহিনী

আমার অমল ধবল পালে লেগেছে হাওয়া
ওগো শেষ হয়ে এলো কি সাধের তরনী বাওয়া?”

অমল, ধবল, পাল, তরনী ইত্যাদি শব্দগুলি দেখে যে কেউ ভাবতে পারেন যে চরণগুলি বিশ্বকবির অফুরন্ত কাব্যভান্ডারের কোনাকাঞ্চি হতে টোকা হয়েছে। আসল ঘটনা তা না, লাইন দু'টি এই অধমেরই রচনা। মাঝে মাঝে উচ্চাংগের কাব্যভাব কীভাবে যেন নীরেট মাথাগুলিতেও ভর করে বসে। তবে সুখের কথা এই যে হাজার চেষ্টা করেও কবিতার তৃতীয় পংতিতে প্রবেশ করতে পারি না, নইলে খবর ছিল। বাংলা সাহিত্যে কেউ দ্বিতীয় এক জন রবীন্দ্রনাথ কিংবা দ্বিতীয় একজন নজরুলকে কি সহ্য করতে পারতেন?

এই কাব্যভাবের একটা ইতিহাস আছে। ভূড়ি জিনিষটা আমার বড় না-পছন্দের। বেশ কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছি– শরীরের মধ্যমাংশটা কেমন যেন স্ফীত হয়ে উঠছে। তিন চার মাসের পোয়াতি মেয়েরা যেমন ক্রমশঃ ফুলে উঠা তলপেটের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার অবস্থাও তাই। মাথার উপর সাদা নিশান তো কবেই উড়েছে, যেন কাঁশফুলের বাগান। পেটটাও যদি বেঈমানী করে বসে তবেই গেছি। সুতরাং সকাল-সন্ধায় নিষ্ঠার সাথে হাটাহাটি করি। সেদিন সন্ধায় বেরিয়েছি, পথে দুই রমনীর সাথে সাক্ষাৎ। একটি ঝকঝকে মার্সিডিজের মোলায়েম পেট থেকে বেরিয়ে আসা ললনাদ্বয়ের একেবারে মুখোমুখী। বাব্বাহ্ ! মানুষ এত সুন্দরও হয় ! সাক্ষাৎ হুরপরী। সাধে কি আর হাফিজ প্রিয়ার মুখের একটা তিলের বিনিময়ে বোখারা ও সমরখন্দের মতো সম্পদশালী দু'টি নগরী বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন? এমন একটা মেয়ের জন্য আমাদের ঢাকা-চিটাগাং অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারি।

দাদার বয়েসী একটা লোকের এইরূপ হ্যাংলার মতো চাহনী দেখে মেয়েটি স্পষ্টতই বিরক্ত হলো। ঝামটা মেরে সুন্দর মুখটা আরেকদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গটগট করে চলে গেল। আর তখনই উপরের লাইন দু'টি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল। হায়, মেয়েটিকে আমি কী করে বুঝাই যে আমার চাহনীর মধ্যে কোন লালসা ছিল না। সে কেবল সুন্দরের প্রতি মানবমনের শ্বাশ্বত অনুরক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাগানে ফুল ফুটলে কে না সেদিকে চেয়ে থাকে?

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের চুল দাড়ি পাকে, পেট মোটা হয়। এটা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু সাথে সাথে মানুষের মনের বয়স বাড়ে না কেন? প্রকৃতির এ কেমন বিচার? চুল দাড়ির সাথে সাথে যদি মনের বয়সটাও মানুষ টের পেত তা'হলে অনেক ঝামেলার হাত থেকে সে রেহাই পেত। আপনি জানেন আপনি এখনও একজন টগবগে তরুন।

কালও রাত দশটা পর্য্যন্ত ক্লাবে ধুমছে তাস পিটিয়েছেন, দিব্বী দশ কাপ চায়ের সাথে গোটা এক প্যাকেট লীফ ফুকে দিয়েছেন। সকালে বাসে উঠেছেন, হাড় ডিগডিগে স্যাৎস্যাতে চেহারার কন্ডাক্টর বলে উঠল– 'এই যে জ্যাঠা, চাইপা বছেন তো। আপনে একলাই তিন জনের সিট দখল কইরা বইছেন হালায়...'। রাতের মধ্যে কখন যে আপনি প্রমোশন পেয়ে জ্যাঠা হয়ে গেছেন টেরও পাননি। এর পরেও কন্ডাক্টরের গালে একটা চড় কষিয়ে দেননি কিংবা লাফ মেরে নেমে যাননি এমন যদি হয় তা'হলে বলতে হবে আপনার ধৈর্য্যগুন অসীম।

একদিন রিক্সা করে যাচ্ছি– চমৎকার চেহারার একটি মেয়ে চোখে পড়ল। শ্যামলা রংয়ের লম্বা ছিপছিপে দেহটি চাবুকের মতোই ধারালো, মনে দাগ কেটে বসে। কী বুক, কী পাছা– বারবার চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কয়েকদিন পর বড় আপার বাসায় গিয়েছি, সেই মেয়েটি বাসায় ঢুকল। আমার আদরের ভাগ্নী নার্গিসের সাথে পড়ে– নাম তুহিন। পাশের রুমে নার্গিস-তুহিনের আলাপের টুকরা-টাকরা কানে আসে।

–'ড্রয়িং রুমের বুড়াটা কে রে'?

– 'আমার সেজো মামা'।

– 'তোর আপন মামা '!

– 'হ্যা, কেন চিনিস নাকি'?

– 'আরে না, আমি চিনব কীভাবে? খালাম্মা এত সুন্দর তার ভাইটা এমন কেন রে? মাগীর দালালের মতো দেখতে, চোখের দৃষ্টি কী বিশ্রী'?

ছিঃ। আজকালকার মেয়েদের মুখ এত রাবিশ হয় ! একেবারে নর্দমা। হাজার হলেও আমি তার বান্ধবীর মামা, গুরুজন। গুরুজনের উপর এইরূপ অশ্লীল বিশেষণ আরোপ– 'মাগীর দালাল'! মনটা একেবারেই তিতা হয়ে গেল। সব রাগ গিয়ে পড়লো মাথার কাঁশফুলগুলির উপর। এদের জন্যেই আমার এত হেনস্তা, কোথাও মুখ পাই না। সবাই বুড়ো ভাবে। কয়দিন আগেও তুহিনের মতো কত মেয়ে লাইন মারতে আসত– এই কয় বছরে এমন কী বুড়ো হয়ে গিয়েছি যে মাগীর দালাল হয়ে গেলাম? যত নষ্টের গোড়া আমার এই রূপালী চুলগুলি। ব্যাটাদের শায়েস্তা করতেই হয়।

পরের দিনই আচ্ছা করে কলপ লাগাই। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই মুগ্ধ। বাহ্, বেশ হয়েছে। কাঁশফুলের বাগানে এখন একরাশ ঘন কালো চুল। খুশী মনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই। ঘন ঘন আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে যেতে ইচ্ছে করে। ছেলেমেয়েরা বাপের এই রূপান্তরে মুখ টিপে হাসে। তাদের কাছে মুখ বাঁচাতে বলতে হয়– 'কী করি বল্? সদাগরি অফিসের চাকরি, একটু স্মার্ট না থাকলে চাকরি রাখা মুশকিল। যে কোন দিন ছাটাই করে দেবে'।

মোহম্মদপুর বড় সমন্ধীর বাসায় বেড়াতে গেছি, ভাবী আমাকে দেখে হেসেই অস্থির। –'এমা, সুভির আব্বাকে কেমন ছাল উঠা মুরগীর মতো লাগছে'।
এখন আপনারাই বলুন– আমি কোথায় যাই? জলে কুমির, ডাংগায় বাঘ। একদিকে ছোলা মুরগী, আরেক দিকে মাগীর দালাল। এখন আমি কোনটা বেছে নেই? অনেক ভেবেচিন্তে ডিসিসন নিলাম– আমার কাঁশফুলই ভাল। ছোলা মুরগী একটা জঘণ্য জিনিষ, তার চেয়ে মাগীর দালাল উত্তম।

আমার ডিসিসন যে ভুল চিল না তার প্রমান রেখেই এই কাহিনীর ইতি টানব। সেবার একটা টিমের সাথে কয়েকদিনের জন্য দুবাই দেছি। চারজনের টিম। আমি ছাড়া বাকী তিনজনের দু'জন ইন্ডিয়ান, একজন লেবানীজ। হলিডে ইনে আমাদের জন্য দু'টো রুম বুক করা ছিল। একেক ঘরে দু'জন করে থাকতে হবে। মাদ্রাজের পার্থসারথী আমার সমবয়েসী। বাকী দু'জন একেবারেই চ্যাংড়া। দুবাই মধ্যপ্রাচ্যের ইউরোপ। ভাবলাম আমি আর সারথী এক রুম নেব, ছোকরা দু'জন এক রুমে থাকবে। বয়স কম, একটু ফুর্তি-ফার্তা করে বেড়াক। কিন্তু হোটেলের কাউন্টারে পাশার দান উল্টে গেল। ইন্ডিয়ান দু'জন রিসিপসনিষ্ট মহিলার কাছ থেকে ঝট করে ৩০০২ নাম্বার রুমের চাবী নিয়ে উপরে উঠে গেল। আমি পড়লাম হামদু'র ভাগে– সে আমার হাটুর বয়েসী। অবশেষে হামদু হেসে ফেলল। বলল– 'ওয়েল, আই উইল লিভ উইথ মাই ফাদার'।
জয় কাঁশফুল, থুক্কু কাশফুল জিন্দাবাদ। একজন বিদেশী তরুনের কাছ সে থেকে কতো সহজেই না পিতার সম্মান আদায় করে নিতে পারে!!
রিয়াদ, ৩০শে জুন, ২০০০ সাল

জিলানীর ঢাকা সফর

সুমন- শান্তার ছোট্ট সংসারটিতে আবার ছন্দ ফিরে এসেছে।

অফিস থেকে বাসায় ফিরতে এখন আর ভয় করে না, ছুটির দিনগুলিও কেমন হালকা ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে আবির্ভূত হয়। অথচ কয়দিন আগেও কী দিনই না গেছে। ধুলোয় মোড়া কিচকিচে চেয়ার টেবিল, ময়লা জামা- কাপড় জানালার পর্দ্দা, শ্যাওলাধরা বাথ রুম, কিচেন থেকে যে গন্ধ ছড়ায় তাতে নিউ মার্কেটের মাছের বাজারও লজ্জা পাবে। সারাদিন অফিসে ভুতের বেগার খেটে বাসায় ফিরতে রীতিমত ভয় করত সুমনের, শান্তার মেজাজ আজ কত ডিগ্রিতে চড়ে আছে কে জানে? বাথরুম ঘষতে যেয়ে হাত কেটে সেদিন বিচ্ছিরি কান্ড, হাত কাটার মূল আসামী যেন সুমন নিজেই। শান্তার কথা- বার্তায় মনে হয় যেন ঢাকা শহর থেকে সমস্ত কাজের বুয়াদের সুমনই তাড়িয়ে দিয়েছে, শান্তাকে শায়েস্তা করার জন্য সুমনই রাজ্যের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তৈরী করে রেখেছে।

কোন বুদ্ধিমান স্বামীই স্ত্রীদের এই অভিযোগের প্রতিউত্তর করে নাই। সুতরাং সুমনও মুখ বুজেই সব সহ্য করে যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন দুপুরবেলা মধুর সুরে কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখা গেল- দুজন রমনী। শান্তা পাকঘরে কী যেন করছিল, কথা শুনে দৌড়ে এসে হামলে পড়ে।

- কাশেমের মা, এই তোমার আক্কেল- এ্যা! সাত দিনের কথা বলে আজ একমাস তোমার দেখা নাই।
- কী করুম আফা, কইন। পছন্দমত লোক খুইজা বাইর করা মুখের কথা না। যাও পাইলাম, মরা হরতালের লাই আইতাম পারি না।

কাশেমের মা নেত্রকোনা-গফরগাঁও অঞ্চলের লোক। পেশায় বুয়া সাপ্লায়ার। সে ভাটি অঞ্চল থেকে কাজের মেয়ে যোগাড় করে ঢাকা শহরে বাসায় বাসায় সাপ্লাই দেয়, রেট মাথাপিছু দুইশ টাকা। এ লাইনে তার প্রচুর সুনাম, তার সাপ্লাই দেয়া মেয়েরা কোন অঘটন ঘটাবে না-সে তার পুরা জিম্মাদার। হাতিরপুল থেকে কমলাপুর--বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার কাজকর্ম। শুধু সাপ্লাই দিলেই তার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল না, বাসায় বাসায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের খোঁজ-খবর রাখা, তাদের বেতনের টাকা মাসে মাসে দেশের বাড়িতে পৌঁছে দেয়াও তার ডিউটির আওতায় পড়ে। পেশার ব্যাপারে সে অত্যন্ত অনেষ্ট ও দায়িত্বনিষ্ঠ।

প্রথম ঝাপটা কেটে যাওয়ার পর শান্তা এবার তার সওদা পরখ করতে লেগে যায়। কাশেমের মা র আড়ালে হালকা পাতলা গড়নের উনিশ-বিশ বছরের এক ছুকরি মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রং এক কালে ফরসা ছিল বলেই মনে হয়, তবে রোদ-বৃষ্টির অবাধ প্রতাপে তা এখন তাম্রবর্ণ। সদ্য বোটা ছেড়া আমের মত পল্লীর রস এখনও তার গাঁয়ে লেগে আছে-একেবারে গেঁয়ো।

বছর দেড়েকের অস্থিচর্মসার এক শিশু ক্যাংগারুর ছানার মত বুকের সাথে লেপ্টে আছে। শান্তা হতাশ সুরে বলে- এতদিন খুজে পেতে তুমি এইটারে নিয়ে এলে কাশেমের মা? ঐটুক পোনা নিয়ে বাসায় বাসায় কাজ করব? ভারী বয়েসী একজন নিরাছাড়া মানুষ খুজে পেলে না?

- হে চিন্তা আপনের করন লাগত না আফা, আপনের কাম অইলেই অইল। আপনে কাম বুইজা নিবেন, মাস গেলে মায়না দিবেন।

কাশেমের মা প্রফেশনাল লোক, কাষ্টমারকে ফাঁকি দিলে তার বিজিনেস টিকবে না। সে খাটি মালই দিয়েছে এবার। দু দিনেই ঘর-দোরের চেহারা ঘুরে গেল। বাথরুমের ওয়াশ বেসিন গুলি পর্য্যন্ত সাদা ধবধব করছে, ফ্লোর এত পরিস্কার যে পা রাখতে মায়া হয়। স্ত্রীদের কাছে অন্য মেয়েলোকের কাজের প্রশংসা করা উচিত নয়, প্রশংসার হকদার একমাত্র স্ত্রীরা। সুতরাং সুমন বলে- শান্তা, আবার তুমি বাথরুমে হাত লাগিয়েছিলে? একবার হাত কেটেও তোমার আক্কেল হলো না?

- ধ্যাৎ কী যে বলো না, আমি হাত দিতে যাব কেন? বাথরুম জিলানীর মা পরিস্কার করেছে।

- জিলানীর মা আবার কে?

- আমাদের নতুন বুয়া। ঐ যে শালিকের ছানার মত পিচ্চিটা দেখেছ না, তার নাম আবদুল কাদের জিলানী। হাসতে হাসতে শান্তা জবাব দেয়।

- হ্যা, ওদের ব্যাপার স্যাপার ঐ রকমই। ছেলেমেয়েদের বড় বড় সব নাম রাখবে। আমাদের আগের বুয়ার ছেলের নাম মনে আছে-মৈমুর বাদশাহ্!

- মনে থাকবে না কেন, মেয়ের নাম ছিল বানেছা পরি। পুথি থেকে ছেলেমেয়েদের নাম বাছাই করে ওরা। সে যাক গে, আজ কিন্তু তোমার দিবানিদ্রা ষ্টপ, মীরা-মামুন সাড়ে তিনটায় আসবে। পাবলিক লাইব্রেরীতে হুমায়ুনের নতুন ছবির প্রিমিয়ার - মনে আছে তো? আজ দল বেধে ছবি দেখব- ঘুরব। বলো তো- কতদিন হয় আমরা বাইরে যাই না, ঘুরি না।

বলতে বলতে সুমনের কাছে ঘন হয়ে আসে শান্তা। সংসারে একজন কাজের মানুষ না থাকাতে যে তালটা কেটে গিয়েছিল তা আবার মধুর সুরে বাজছে। অলস নিশ্চিন্ত স্বপ্নময় দুপুর, সোনালি যৌবন- এমন দিনে শুধু হারিয়ে যেতেই ইচ্ছে করে, দুজনায় দু জনেতে শুধুই ডুবে থাকা।

একটি অপরূপ সংগীত সন্ধ্যা মনে প্রানে উপভোগ করে সুমন-শান্তা যখন ঘরে ফিরছিল তখন রাত নয়টা। মাথার উপরে ডিসেম্বারের নীল আকাশ, সেখানে দু চারটি তারা মিটমিট করে জ্বলছে। মূত্রগন্ধী ঢাকা শহরও মাঝে মাঝে তার অপরূপ রূপ মেলে ধরে - তরুণ তরুণীদের মনে দোলা দেয়- ভাবে সুমন।

শাহবাগের মোড় ঘুরে সুমনদের রিক্সা হঠাৎ করেই ডানে মোড় নিল। ড্রেনের উপর সারি সারি বস্তি। একটা নারকীয় দুর্গন্ধ সুমনকে সজাগ করে তোলে।

একটা কথা তার মনের পর্দ্দায় ঢেউ খেলে যায়- আজকের সংগীত- সন্ধা উপভোগের পেছনে যার অবদান সর্বাধিক, সেই হতভাগ্য মেয়েটি তার শিশু সন্তানসহ এই বস্তির কোন ঘরেই রাত্রি যাপন করছে। এটাই আব্দুল কাদের জিলানি ও তার মায়েদের আবাসস্থল!!

(২)

মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন ওরফে জিলানির মা র দিনকাল ইদানীং খুব ভাল যাচ্ছে। কয় মাসেই তার চেহারার দিব্বী খোলতাই হয়েছে, আগের সেই হাড় জিরজির ভাব আর নাই। শান্তা তাকে কয়েকটা পুরানো শাড়ী ব্লাউজ দিয়েছে। সেগুলির লাইফ যদিও শেষ তবুও তাতে তাকে ভালই মানায়, ভদ্রলোকের মেয়ে বলে মনে হয়। আজ সে কাজের ফাঁকে শান্তাকে বলল- খালা, আইজ আমারে সকাল সকাল ছুটি দেওন লাগব। শাবানা আফারে দেকফার যামু।

- সেকী, শাবানা আফাটা আবার কে?

সুফিয়া লজ্জিতভাবে বলে- ভুল অইয়া গেছে গা খালা, মানুষ না, বই। বলাকায় একটা বই আইছে- রানী যখন দাসী। বুজি চাইরবার দেখছে। শাবানা আফা যা এ্যাকটিন করছে, চউখ্যের পানি নাকি রাহন যায় না।

সুফিয়ার বুজি যে সে লোক নয়, দারোগা টাইপের এক জবরদস্ত মহিলা। মাসিক একশ টাকা ভাড়ায় তিন হাত বাই চার হাত যে ঝুপড়িটাতে জিলানিরা থাকে, বুজি তার অর্ধেক শেয়ার হোল্ডার। বস্তির কাক-চিলদের ছোবল হতে এ যাবৎকাল বুজিই তাকে বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করে এসেছে। সেই বুজির চউখ্যে যখন পানি এসেছে, তখন বইটা যে মারাত্মক তাতে কোন সন্দেহ নাই।

শান্তা ধানের শীষের ভক্ত। বাসায় কাজের মানুষ কেউ নৌকাঘেষা হলে তাকে পটিয়ে পাটিয়ে ধানের শীষে নিয়ে আসাটাকে ছোয়াবের কাজ বলে মনে করে। সেদিন সুফিয়াকে সে প্রশ্ন করে- আচ্ছা সুফিয়া, গত ইলেকশানে তুই কাকে ভোট দিয়েছিলি?

সুফিয়া গ্রাম ছেড়েছে বেশীদিন হয় নাই। শহরের ভাব অর্থাৎ মনের ভাব গোপন করার কালচার এখনও ভালভাবে রপ্ত করে উঠতে পারে নাই। সুতরাং সে খুশীমুখে জবাব দেয়- আমরার দ্যাশে হাছিনার জোর বেশী খালা, হগ্গলে নায়ে ভোট দিছে। গেলবারও নৌকা মার্কা জিতছিল।

শান্তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এই ইষ্টুপিড মেয়েটাকে সাইজ করার গুরুদায়িত্ব এখন তার কাঁধে চেপেছে। অবশ্য তাড়াহুড়ার কিছু নাই, নৌকা মার্কা যে কীরূপ খারাপ, ধানের শীষ যে দেশের জন্য কতটুকু মঙ্গলজনক এই গুহ্য তত্ত্বটা মেয়েটার মগজে আস্তে আস্তে ঢোকাতে হবে। এই লক্ষ্যে বেশ কিছুদিন নিরলসভাবে কাজ করে যায় শান্তা। কিন্তু তার মন্ত্র কতটুকু কার্যকরী হয়েছে তার পরিমান সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। হাসিনা-খালেদার তুলনামূলক চিত্র আঁকতে গিয়ে তার গলদঘর্ম অবস্থা, অথচ বোকা মেয়েটা কি না বলে ট্ট

আমরা মুখ্যসুখ্য মাইয়া মানুষ অত জ্ঞানের কতা বুঝি নি খালাম্মা। ঘরের মাইনষে যেহানে ভোট দিতে কয় সেহানেই সিল মারি ।

সেদিন সুফিয়াকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। অন্যদিনের তুলনায় কাজ করছিল যেন উড়ে উড়ে। শান্তা জিজ্ঞেস করে- কিরে সুফি, এত খুশি কেন? তোর পা দেখি আজ মাটিতে পড়ছে না, ব্যাপার কি?

লজ্জায় মুখটা নীচু করে ফেলে সুফিয়া। বলে- কী যে কইন খালাম্মা। আমরার আবার খুশি, গুঞ্জারও আবার চিৎ অইয়া শোয়ন। কাইল বিয়ালে জিলানির বাপ আইছে, একটু জলদি ফিরন দরকার - তাই তাড়াতাড়ি করতাছি।

- বলিস কি, হঠাৎ করে তোর সোয়ামি হাজির! তোকে দেশে নিয়ে যেতে চায় নাকি? শান্তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

- না না, হেসব কিছু না খালা। দ্যাশে কামকাইজ কিছু নাই, মাসের অর্ধেক দিনই উফাস। দ্যাশে গিয়া কী করতাম? হেতাইন আইছে কিছু টেকা পয়সা নেওনের লাই।
- মানে!
- মাইনষের বাড়িত কামলা দিয়া প্যাট চলে নাগো খালাম্মা। তাই নিয়ত করছি, জিলানির বাপরে যুদি একটা ভ্যান গাড়ি কিইনা দিতে পারতাম। আমার কাছে হাজার টেকা জমছে, আপনে যুদি এই মাসের বেতনডা আগাম দিয়া দেন তাইলে হেতাইনরে মিলঝুল কইরা হাজার দেড়েক টেকা দিয়া বিদায় করতাম পারি।

শান্তা অবাক হয়ে সুফিয়ার কথা শুনছে। একরত্তি এই মেয়েটা জীবনের শত ঝড়ঝাপটাতেও ভেংগে পড়ে নাই, বস্তির পূতিগন্ধময় পরিবেশ তার জীবন সংগ্রামকে একবিন্দু বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে নাই। স্বামীপুত্র নিয়ে একটি সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নাঞ্জন তার চোখ দুটিতে এখনও অম্লান। সেই সংগ্রামী চোখের দিকে তাকিয়ে জীষণ লজ্জা পায় শান্তা।

(৩)

গতকাল সুফিয়া কাজে আসে নাই। দোতলার রীমাদের বাসায়ও কাজ করে সে। শান্তা খোঁজ নিয়েছে কাল সেখানেও সে যায় নাই। খবর না দিয়ে কখনও কাজ কামাই করে না সুফিয়া। চিন্তিত মুখে দুপুরের পাকের আয়োজন করছিল, এমন সময় ছেলে কোলে সুফিয়া হাজির। সুফিয়াকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তার মুখের কথা যেন মার খেয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এ কী চেহারা হয়েছে মেয়েটির!! একটা মাত্র দিন, তার মধ্যে মানুষের চেহারার এমন পরিবর্তনও হয়!

ঝড়ে বিধ্বস্ত এক জনপদ যেন, ঘরদোর সব উড়ে গেছে, গাছগুলি দুমড়ে মুচড়ে একাকার- এখানে সেখানে দু চারটি খামখোটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত খাপছাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। সুফিয়ার চোখগুলো রক্তজবার মত লাল, মাথার চুল উস্কুখুস্কু। কাপড়-চোপড়ে কাদামাটির দাগ লেগে আছে। কোন এক দূর্দান্ত পশু যেন রাতভর ধর্ষন করে ছিবড়ে করে ফেলেছে মেয়েটিকে।

-কী হয়েছে সুফিয়া, তোর এ হাল হলো কীভাবে? চীৎকার করে উঠে শান্তা।
কিন্তু যে জবাব দেবে তার মুখে কোন কথা নাই, ফুলে ফুলে কাঁদছে শুধু। মায়ের কান্নার সাথে তাল মিলিয়ে জিলানিও মাঝে মাঝে কান্নার চেষ্টা করছে, তবে দেড় বছরের শিশুকে কৃপণ বিধাতা জীবনীশক্তি এতই কম দিয়েছেন যে সে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। মাঝে মাঝে দু চারটা হেচ্‌কি তুলেই ক্ষান্ত হচ্ছে। অবশেষে আসল ঘটনাটি জানা গেল। সদাশয় সরকার গতকাল তাদের বস্তিটি ভেঙ্গে ফেলেছে, পাপের আঁখড়া নির্মূল করা হয়েছে। নগরবাসীদের জীবনযাত্রা এবার সুখী ও নিরাপদ হবে।
শান্তা বলে- মুখপুড়ি, কাল সারাদিন সারারাত তুই কোথায় ছিলি? বস্তি ভেংগে ফেলেছে বেশ করেছে, তুই আমার বাসায় চলে এলি না কেন ?
সুফিয়া বলল- কী করতাম খালা। সহালে সরদার কইল- হগ্‌গলে মিলা পুলিশরে বাদা দেওন লাগব। তাই সহাল থেইকাই হগ্‌গলে রেডী অইয়া খাড়াইয়া আছিল। পুলিশ আইলেই চোলোগান দিয়া পুলিশের উপর গিয়া পড়ল। পুলিশ গ্যাস ছাড়ল, লাঠি দিয়া পিটাইয়া কয়েকজনের মাথা ফাটাইয়া দিল। খালাগো, আমার বুজিরে পুলিশে ধইরা নইয়া গ্যাছে গা..... ।

- উচিৎ কাম করছে। তোরা ভাড়া দিয়া থাকিস, ভাড়া যারা নেয় তারা পুলিশ ঠেকাক। তোদের পুলিশের সামনে যাওনের কোন কাম আছিল? তোরা পুলিশ মারবি, আর পুলিশ তগো কোলে নিয়া চুমা দিব?
- বস্তি ভাংগার কথা হুইনা হগ্‌গলের মাথায় য্যান বাজ পড়ল গো খালা-- এতগুলা মানুষ কই যাইত। কারও মাথা ঠিক আছিল না খালা, সারাডা রাইত এই দুধের বাচ্চা নইয়া গাছতলায় বইসা রইছি গো.....

সুফিয়াকে নিয়ে বেশ বিপদেই পড়ে যায় শান্তা। তাদের ছোট্ট বাসায় বাড়তি লোকের এমনিতেই জায়গা নাই- তার উপর সুফিয়া নিতান্তই কাচা বয়েসী একটা মেয়ে। ছেলেটাও নোংড়ার একশেষ, যত্রতত্র পেশাব-পায়খানা করে ঘরদোর নোংড়া করে ফেলে। অথচ তাড়িয়েও দিতে পারছে না, আসার পরদিন থেকেই ছেলেটার আকাশ-পাতাল জ্বর। অসহায় একটা মেয়েকে এই অবস্থায় তাড়িয়ে দেয়া যায়?
স্বামী-স্ত্রীতে এই সমস্যা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। সুমন বলল- আমার মনে হয় বাচ্চাটার নিমোনিয়া হয়েছে, বাসায় না রেখে হাসপাতালে পাঠানোই ভাল ছিল।

- এতগুলি টাকার অষুধেও কাজ হবে না কে জানত বাবা। আজকের রাতটা ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি, কাল সকালেই তুমি হাসপাতালে দিয়া আসবা। নিজের জ্বালায় বাঁচি না, তার উপর এইসব উটকো ঝামেলা।

শান্তার একটু ভুল হয়েছিল, জিলানিরা কখনও ঝামেলা করে না। সারাজীবন এরা শুধু দিয়েই যায়, কারও কাছ থেকে পায় না কিছুই। সুতরাং পরদিন হাসপাতাল খোলার আগেই শান্তাদের রেহাই দেয় জিলানি।

অনাহার, অবহেলা আর অনাদরের এই পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে, তার ছোট্ট ক্লান্ত চোখদুটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম সন্তান হারানোর বেদনায় হতভাগ্য মায়ের আর্তনাদে পৃথিবীর কেন্দ্রে কাঁপন ধরিয়েছিল, কিন্তু মানুষের কানে তা পৌছয় নি। কারন ঠিক সেই সময় রাজপথ দিয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এক বিরাট মিছিল যাচ্ছিল। মিছিল থেকে গগনবিদারী রব উঠছিল- মানি না মানব না, দিতে হবে মানতে হবে। ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও। পুড়িয়ে দাও। মিছিলের বজ্রকণ্ঠ আওয়াজে এক দুঃখিনী মায়ের আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।।

স্থান - মাহাত্ম

আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি-ঢাকা শহরে যত ঝকঝকে গাড়ি আছে, তাতে চড়ে যে সব মহিলারা ঘুরে বেড়ান তাদের অধিকাংশই খুব সুন্দরী হয়। গাড়ি যত সুন্দর মেয়েটি তত সুন্দরী, গাড়িটি যত লেটেষ্ট মডেলের আরোহিনীও ততই আকর্ষনীয়া। মাখনের মত নরম বুক, কমলার কোয়ার মত টুবা টুবা ঠোঁট, চুল যেন মখমল। একটি ঝকঝকে নুতন গাড়ির পেট হতে ঝলমলে তরুণীর বদলে কালো কুৎসিত পেত্নি চেহারার একটি মেয়ে নেমে আসল- ভাবাই যায় না।

এর কারণটা নিয়ে বিস্তর চিন্তা ভাবনা করেছি। জুৎসই সমাধান মিলেনাই। সেদিন সকালে বাজার করতে গিয়ে নিমেষেই সমাধান পেয়ে গেলাম।

বুড়ামত এক লোক কলা নিয়ে বসে আছে। বাসায় আমার এন্ডি-গেন্ডি অনেক কয়টা মুখ- দু'চার হালি কিনলে নিমিষেই উধাও হয়ে যায়-দামও পড়ে ডবল। কাঁদি হিসাবে কিনলে পাইকারি দাম-ভাল পরতা পড়ে। সুতরাং কলাওয়ালার সাথে দামাদামিতে লেগে যাই। কথা চালাচালির এক পর্যায়ে বললাম-'এত দাম চাও, অর্ধেক কলাইতো কাঁচা। পাকব না দরকচা ধরে থাকব কে জানে?'

জবাবে কলাওয়ালা বলল- 'অর্ধেক কাচা দেইখাই তো দাম বেশী চাচা। আস্তে আস্তে পাকব, আয়েশ কইরা বেচবেন। সব একসাথে পাকলে তো আধা দামে বেচা লাগব'।

বেটা আমাকে মুদি দোকানদার ধরে নিয়েছে! আমার চেহারা কি তাহলে মুদীওয়ালার মত হয়ে গেছে? বেশ রাগ হয়, হাজার হলেও আমি একজন সরকারী অফিসার। তবে আর একটা কথা মনে হতেই সব রাগ পানি হয়ে যায়। গাড়িতে ঘুরে বেড়ানো মেয়ে গুলো এত সুন্দর কেন হয়- মুহুর্তেই সে রহস্য পরিস্কার হয়ে যায়। সব সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে পয়সা, যেখানে পয়সা সেখানেই সৌন্দর্য। গাড়ি-গুলিতে তাই এত সুন্দরীদের মেলা। আমার উপরি আয় নাই, পয়সা নাই- তাই সরকারী অফিসার হলেও আমাকে মুদীওয়ালার মত দেখায়।

আমার বউ শোভা, একদিন সে সত্যিই শোভা ছিল, দশ বছরে পাঁচ পাঁচটি বা□চা বিইয়ে একেবারে কাজের 'মাতারি' বনে গেছে। স্থান-মাহাত্ম্য। শোভা যদি আমার বউ না হয়ে কোন ওসি কিংবা কোন কাষ্টম ইন্সপেক্টরের বউ হতো তাহলে সেও যখন গাড়ি হতে নামত তাকে ছুরপরীর মতো লাগত। ধাঁধাঁটা জলের মত পরিস্কার।

বাজার সেরে ফেরার পথে। অর্চির আম্মার সাথে দেখা। ছুটির দিনে এই ভর-দুপুরে সাজগোজ করে কোথায় যেন যা□ছ। অর্চির মা সদা-হাস্যমুখী মহিলা, এই মহিলাকে কখনও বেজার মুখে দেখি নাই। সে হাসতে হাসতে বলে- আমাদের কি আর ছুটি টুটি আছেরে ভাই। প্রাইভেট চাকরি, কল আসলেই দৌড়াও। তা কী মাছ আনলেন ? ইস্, বড় ভুল হয়ে গেছে। অর্চির আব্বা বাসায় নাই, আপনার কাছে দিলেই আমাদের জন্যও মাছ মাংস কিছু কিনে নিয়ে আসতে পারতেন। আমার ফিরতে ফিরতে সেই বিকাল - তখন কি আর বাজারে ভাল কিছু থাকবে ?

- কেন, আপনার ঝর্ণা ?

আমার কথায় অর্চির মা'র মুখের ভাব মুহূর্তেই বদলে যায়। আমার গা ঘেষে এসে দাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে- অই ঢলানির কথা আর বলবেন না ভাই, কী জ্বালায় যে জ্বলছি। না পারি রাখতে, না পারি খেদাতে। একটু চোখের আড়াল করলেই কারবার শ্যাষ। সুযোগ পেলেই নীচতলায় বাড়িওলার ড্রাইভারটার সাথে ফুস-ফাস, চোখ মারামারি।

-বলেন কী, সে তো একটা আধ-বুড়া লোক ! দ্যাশে বউপোলাপান আছে।

আমার কথায় মহিলার গলা আরও খাদে নেমে যায়, একেবারে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে-আধা-বুড়া তো কী হয়েছে ? জানেন, বুড়াওলাই বেশী খ□চর। এত গার্ডে রাখি তাও সামলাতে পারি না। বিশ্বাস করবেন না, সেদিন ছেমড়ির বিছানার তলায় দেখি একগাদা রাজা কনডম !! আমার তো হাত-পা ঠান্ডা। এত পেটালাম কিছুতেই মুখ খুলে না। বদের হাড্ডি। এখন বাইরে গেলে ঘরে তালা মেরে যাই, আমার সাথে চালাকি।

বেশ কয়েক বছর ধরে মহিলা আমার প্রতিবেশি। স্ব□ছল পরিবার, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রোজগার করে। সেদিন রাতে ঝর্ণার গগনভেদী চীৎকারের কথা মনে পড়ল- ঘটনা তাহলে এই।

আরও কিছুক্ষণ দিব্বি অর্চির আম্মার সাংসারিক কাহিনী শোনা যেত, মহিলার গা থেকে চমৎকার একটা সুগন্ধ বের□চ্ছ দামী কোন সেন্ট মেখেছে বোধ হয়। আমার মত পাতি লোকের সাথে অর্চির আম্মাদের মত মহিলার ঘনিষ্টতা না দেখালেও চলে, মহিলা নেহায়েত খোলামনের মানুষ বলেই প্রতিবেশীদের সাথে 'গুড টার্ম' বজায় রাখতে চায়। কিন্তু মুশকিল আমার বউটাকে নিয়ে, সে আবার এসব মোটেই পছন্দ করে না। কুয়োর ব্যাং হলে যা হয় তাই আর কি। তাকিয়ে দেখি তিনি তেতালার বারান্দা থেকে সর□ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে চেয়ে আছেন। অর্চির আম্মার মত তিনিও আমাকে গার্ডে রাখছেন বোধ হয়। সুতরাং কথা আর না বাড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে বাসার দিকে এগুই।

বাসায় ঢুকতেই মেজো মেয়ে সুভি দৌড়ে আসে।
- আব্বা, জাফর আংকেল এসেছিল, বড় চাচা দেশে এসেছে। বড় চাচা নাকি এবার মোটে তিন দিন থাকবেন, তোমাকে অবশ্য আজ বিকেল পাঁচটায় হোটেলে তার সাথে দেখা করতে বলেছে।
সুভি একটা চলন্ত গেজেট-ইন্টারনেটও বলা যায়। বাসায় ঢোকা মাত্র সারাদিনের চলতি বিবরনী দেয়ার জন্য সে মুখিয়ে থাকে। বারান্দায় একজোঁড়া চড়ুই দম্পত্তি বহুদিন যাবৎ সুখে ঘরকন্না করে আসছে, তাদের যে দু'টো ছাঁ' হয়েছে এটা সুভির কাছে একটা বিরাট বিষয়, সেই খবরও সোনামুখ করে আধঘন্টা ধরে তার কাছে বসে শুনতে হবে। নইলে মুখ ভার, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। সুতরাং হাসি মুখে বলি-বেশ, তাই নাকি। এখন যা, ব্যাগটা রান্নাঘরে দিয়ে আয়।
-তুমি যাবে না, আজই কিন্তু। বিকাল পাঁচটায়। আজ না গেলে বড় চাচাকে আর পাবে না, কাল থেকে দুই দিন তার বাইরে 'টুর' আছে।
-আরে পাগলি, পাঁচটা বাজুকতো আগে। এখন যা, তোর মাকে এক কাপ করতে বল।
আমার ভাইদের মাঝে আমিই সবচেয়ে অপদার্থ, ব্যাকরণের ভাষায় যাকে বলে অপদার্থতম। আর সকলের গাড়ি-বাড়ি আছে, বড়ভাই তো আন্তর্জাতিক মানের মানুষ। বহুবছর ধরে জাতিসংঘের একটা সংস্থায় মোটা বেতনে চাকরি করেন- ওয়াশিংটনে তার দপ্তর। সংস্থার কাজে বছরে ছয়মাসই তাকে দুনিয়ার তাবৎ দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়। দু'চার মাস পর পরই তিনি ঢাকায় আসেন, কারও বাসায় না উঠে তিনি সোনার গাঁ অথবা শেরাটনে দিনগুলি কাটিয়ে যান। সেখানে গিয়েই তার সাথে আমাদের দেখা করতে হয়। একই মায়ের পেট হতে কতরকম প্রডাক্টই না বাজারে আসে ? এত ভিবিন্নরূপ মাল আছে বলেই না সৃষ্টিকর্তার এত সাধের বাজারটা এমন জমজমাট হয়ে উঠেছে। তিনি আর যাই হোন, মার্কেটিং সম্পর্কে অগাধ 'নলেজ' রাখেন।
মায়ের শেষ দিনগুলির কথাই মনে পড়ল। আমরা সব ভাই বোন বাড়িতে জড়ো হয়েছি। বড় ছেলের সাথে মায়ের একান্ত আলাপ হচ্ছিল। হঠাৎ করেই আলাপের একটা অংশ আমার কানে আসে। মা বলছেন- তোমাদের সকলেরই তো সুখ দেখে গেলাম, শুধু টুকুর জন্যই চিন্তা। ও একটু বোকা-শোকা, বউটাও হাবলার মতো। এতগুলা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ওর সংসার চালানো বড় কষ্ট হয়। ওর দিকে খেয়াল রাখবা।
-মা তুমি ভেবো না তো। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি টুকুকে দেখব। এ ব্যাপারে তুমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করবা না।
মায়ের মৃত্যুশয্যায় দেয়া সেই প্রতিজ্ঞা বড়ভাই ভুলেননি। যখনই ঢাকায় আসেন, আমাকে গোপনে খবর দিয়ে নিয়ে বিশ-পঞ্চাশ হাজার ধরিয়ে দেন। মায়ের স্নেহই যেন বড়ভাইর হাত হয়ে আমার সংসারকে এখনও বাচিয়ে রেখেছে। বড় চাচার সাবসিডি ছাড়া যে বাপের সংসার অচল ছোট হলেও বাচ্চারা তা বুঝে। তাই বড় চাচার সাথে দেখা করার এত তাগিদ।

সোনারগাঁ-শেরাটন বড় ভীতির জায়গা, সেখানে আমর মত লোকের বিচরণ মোটেও স্বচ্ছন্দ নয়। শ্বেতপাথরের মসৃন মেঝে, দামী কার্পেট আর সুবেশধারী নরনারীর মধ্যে নোংড়া জামাজুতো পড়া একজন লোক বড়ই বেমানান। তবে বন্ধু জাফর আমাকে বাচিয়ে দিয়েছে, সে হোটেলের রুম ডিভিশনে এ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার। পকেটে পয়সা থাকলে ম্যাকডোনালস-মিডনাইটের মত এসব হোটেলেও যে দিব্বি খেয়ে আসা যায় তা জেনে যার পর নাই অবাক হয়েছিলাম। বাইরের ভড়ং-ভোড়ং যতই থাক, ভেতরের মানুষগুলির ব্যবহার খারাপ না, বড়ই অমায়িক। দেখি, জাফর রিসিফসনের পাশেই আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। জাফরের সাথে লিফটের সামনে দাঁড়িয়েছি, লিফট থেকে অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে বেরিয়ে এলো। আশ্চর্য্য, এযে অর্চির আম্মা!

বেশ-ভুষা সেই সকালের মতই, অথচ এখন অর্চির মাকে এত সুন্দর লাগছে কেন? স্থানমাহাত্মে মানুষ এত পালটে যেতে পারে ? অর্চির মাকে এখন আর কারও বউ বা কারও কন্যা বলে মনেই হচ্ছে না- সে এখন শুধুই এক মোহনীয়া নারী।

আরও আশ্চর্য হই জাফরের কথা শুনে, অর্চির মার সাথে কি ওর পূর্ব পরিচিতি আছে?

-গুড আপটারনুন ম্যাডাম, ডিউটি শেষ হলো ?

-জ্বী ভাই, আজ বেশ একটু লেট হয়ে গেল ....।

এতক্ষণ অর্চির মা'র দৃষ্টি আমার দিকে পড়েছে, জনসমক্ষে আমি এতই নিস্প্রভ যে সহজে কারও চোখে পড়ি না। আমাকে এই জায়গায় দেখতে পাবে সে বোধ হয় ভাবতেও পারে নি। মুর্গিওয়ালারমত চেহারার একজন লোককে দেখে অর্চির আম্মার মত চৌকশ মহিলাযে এমন নার্ভাস হয়ে যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। কোন মতে মুখে হাসি টেনে বলল- ভাই আপনি ... এখানে ?

জাফরকে দেখিয়ে বলি - আমার ছোটবেলার বন্ধু, ওর কাছে একটা কাজে এসেছিলাম। তা আপনি না পপুলারে চাকরি করেন, এখানে কীসের ডিউটি ছিল বুঝলাম না তো!

আমার কথায় মহিলা আরও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। জাফরের দিকে একটা করুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুত পায়ে লবির দিকে চলে যায় সে। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই আমার মনে ভেসে উঠে- স্থানমাহাত্ম বড়ই মারাত্মক জিনিষ। স্থানভেদে একজন মুর্গীওয়ালাও কেমন ভীতিকর হয়ে উঠে, আবার একজন সুন্দরী জাদরেল মহিলাও কেমন কেচোর মত হয়ে যায়!!।

একজন বেশ্যা ও নিস্পাপ মানুষেরা

(১)

চৈত্র মাসের রক্তসন্ধ্যা বড়ো মারাত্মক । শুক্লপক্ষ হলে তো কথাই নাই, নির্মেঘ আকাশ হতে জ্যোৎস্না অকৃপণ ধারায় চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকে, তখন আমাদের মতো অরসিক লোকের মনেও কবিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে– "প্রহর শেষের আলোয় রাংগা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ "। এমন দিনে সংসারের কুটকচাল কিছুই ভাল লাগে না, বাসার পেছনের বাগানে গাছ-গাছড়ার সাথে জ্যোৎস্নার গলাগলি রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছিলাম। কিন্তু সংসার রেহাই দেবে কেন, সে রানুর মুর্তি ধরে সামনে এসে হাজির।

– নানা, তাড়াতাড়ি আসেন। হুমায়ুন চাচায় ডাকে, খুব নাকি দরকার।

রানু গরীবের মেয়ে, বছর পাঁচেক আগে নিরাশ্রয় রানুকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলাম । এই কয় বছরেই সে দিব্বি নলবলিয়ে বেঁড়ে উঠে আশ্রয়দাতাকেই আশ্রয় দিতে বসেছে। রানু এখন আমার লোকাল গার্জিয়ান, কথার বিন্দুমাত্র অবাধ্য হলেও মুখ ভার করে বসে থাকে । এই কালি-সন্ধ্যায় আমি ভুতের মত বাগানে বসে থাকব এ তার মোটেও মনোপুত নয়। নানা ছলছুতায় এ নিয়ে পাঁচবার সে আমার ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাল। এবার তার হাতে যে ছুতোটি মজুদ আছে তা অবজ্ঞা করে তাকে ধমক মারার সাধ্য আমার নাই সেটা রানুর খুশীমুখ দেখে অনায়াসেই টের পাওয় যায়। হুমায়ুন সিং কলোনীর সেক্রেটারী, আমি প্রেসিডেন্ট। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা তুলতে হলো।

– কি ব্যাপার সিং, এতরাতে ?

– রাত কই, সবে তো সন্ধ্যা। আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে চাচা, ঘটনাটা একটু অন্যরকম– আমি একা ট্যাক্‌ল করার সাহস পাচ্ছি না।

– আগে শুনি তো ব্যাপারটা কী ?

অনেক ইতস্তত করার পর হুমায়ুন যা বললো তার সারমর্ম এই দাড়ায় যে কলোনীর ডি-টাইপ মহলে সেন্টু শিকদারের বাসায় নিশিকন্যার আগমন ঘটেছে। সেন্টু বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে কয়েকদিন হলো দেশে গেছে, এই সুযোগে তার ছোটভাই মন্টুর এই কীর্তি। কলোনীর সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করার দায় যেহেতু আমাদের, সুতরাং এখনই বিষয়টির ফায়সালা করা দরকার। হুমায়ুন একাই যেত, তবে কোন ভদ্রলোকের বাসায় হানা দেয়া বাংলাদেশ পেনালকোডের কোন্ ধারার অপরাধ সেটা ভেবে সে যথেষ্ট শংকিত। আমি সাথে থাকলে অবশ্য ভয় নাই, খোদ্ মন্ত্রনালয়ের বড়সাহেবের সংগে আমি হরিহরাত্মা।

এমন নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে যথেষ্ট সংকোচ হচ্ছিল, কিন্তু এড়ানোর উপায় কি ?

বাসার বাইরে উৎসাহী যুবকেরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, ফস্কানোর চেষ্টা করলে আবার কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি। কাল ভোরেই হয়তো সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেশবাসী জেনে যাবে যে এলাকার নিষ্কলুষ পূতঃপবিত্র পরিবেশ ধ্বংসের জন্যে আমিই দায়ী।

সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুমায়ুনদের সংগ নিতে হলো, সব রাগ গিয়ে পড়লো সংবাদবাহক রিক্সাওয়ালার প্রতি।

– এই ব্যাটা, তুই ঠিক জানিস তো– সেন্টু শিকদারের বাসা ? ভুল হলে কিন্তু তুই ছাড়া পাবি না।

– কার বাসা আমি জানুম কিবায় ? ডি-বলকের সবার উত্তরের বাসা, নিচতালা। আমি এইমাত্র খ্যাপ নামাইয় দিয়া আইলাম, আপনেরা তাড়াতাড়ি যান। ভুল নাই, আমি জামিন আছি– হুমায়ুন সাব আমার চৌদ্দগুষ্টি চিনে।

বুঝা গেল বখশিসের ঘাপলা হাওয়াতে রিক্সাওয়ালার ধর্মবুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠেছে। যাই হোক ব্যাটাকে ছাড়া যাবে না। বিষয়টি ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তাকে আঁটকিয়ে রাখার হুকুম দিয়ে দলবল সহ অকূস্থলের দিকে রওনা হয়ে যাই।

(২)

বাসাটি কলোনীর একপ্রান্তে উচু বাউন্ডারী ওয়ালের ধার ঘেঁষে, একটি তিনতলা বিল্ডিংয়ের নীচতলায়। এতরাতে দলবল নিয়ে কারও বাসায় হামলা করা রিস্কি কাজ, কিন্তু পেছনে আদি রস থাকলে সমস্যা হয় না। বাষ্প যেমন পেছন থেকে ধাক্কা মেরে বিরাট বিরাট রেলগাড়ীকে চালিয়ে নিয়ে যায়, রসের বাষ্পও তেমনি জনতাকে নিমেষে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আগুপিছু ভাবার সময় নাই, উৎসাহ উদ্দীপনায় মানুষগুলি টগবগ করে ফুটছে। ধর্ষণের কাহিনী থাকলে পেপারের কাটতি কেন হু হু করে বেড়ে যায় সে রহস্য আজ পরিস্কার হলো।

সেন্টু শিকদারের ভাই কিছুতেই দরজা খুলছে না ।

আমির আলী বললো- স্যার, আপনে অর্ডার দিলে দরজা ভাইংগা ফেলি । মাল ঘরে রাইখা কেউ আপসে দরজা খুলে ?

আমির আলী সমাজের এক রহস্যময় চরিত্র । 'ডাইল' প্রজাতির সব ধরনের গোপন ব্যবসার সাথে জড়িত বলে অপবাদ আছে অথচ প্রত্যক্ষ প্রমান নাই, সমাজের ভালো ভালো সব কাজে প্রথম কাতারে থাকা তার জীবনের মূলমন্ত্র । তবে এস্থলে আমির আলীর কথায় সায় দেওয়া চলে না, রাত-বিরেতে অন্যের বাসার দরজা ভাংগা ফার্ষ্ট ডিগ্রি মার্ডারের সমতুল্য অপরাধ ।

নিজেই এগিয়ে যেয়ে দরজায় করাঘাত করি–শিকদার বাসায় আছ নি, দরজাটা একটু খোল তো–

খুট্ করে দরজা খুলে গেল। সুঠামদেহী মন্টু স্থানীয় কলেজের বি. এ ক্লাশের ছাত্র। লোকজন সহ এত রাতে আমাকে তাদের বাসার সামনে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে বলে মনে হলো।

– কী ব্যাপার আংকেল, ভাইজান তো বাসায় নাই। বাসায় আমি একলা আছি....

– এতক্ষণ ধরে দরজা পেটাচ্ছি, কানে কম শুন নাকি–

– সরি আংকেল, আমি ভেতরের রুমে শুয়ে গান শুনছিলাম, মনে হচ্ছিল পাশের বাসার নক। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

এও তো বড় মুশকিল, বাসায় জলজ্যান্ত একজন প্রমোদবালা লুকিয়ে রেখে মগ্ন হয়ে গান শুনে– এমন কখনও হয়! ছোকরার চেহারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিছুটা বা বিস্মিত। কী জবাব দেব ভেবে পাই না। আমার অবস্থা দেখে আমির আলী এগিয়ে আসে।

– আমরা আপনার বাসা সার্চ করুম , আমাদের কাছে খবর আছে এই বাসায় বাজে মাইয়ালোক ঢুকছে।

– কী বলছেন আপনি, মাথা ঠিক আছে তো? আংকেল , এতরাত্রে দলবল নিয়া ভদ্রলোকের বাসায় আসছেন অপমান করতে?

মন্টুর রাগ দেখে ভীষণ দমে যাই আমি। শুনেছিলাম অপরাধী সবসময় দূর্বল হয়ে থাকে, এ যে দেখছি চোখ রাঙায়!

অবশেষে হুমায়ুন এসে হাল ধরে , মন্টুর কাঁধে হাত রেখে বলে–এই যে ব্রাদার , এত রাগের কী আছে? একটু ঠান্ডা হও। কল্যাণ সমিতির কাছে একটা বাজে রিপোর্ট আছে, আমরা জাষ্ট বাসায় ঢুকে একটু ভেরিফাই করে চলে যাব। মিথ্যা হলে দেখে নিও শালার কী অবস্থা করি। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার , ডু'ন্ট মাইন্ড।

কাজ হলো, যুক্তির কাছে নাকি বনের পশুও হার মানে। মন্টু দরজা ছেড়ে দিল। কিন্তু বাসা সুনসান। সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, মানুষ দূরের কথা একটা তেলাপোকাও নাই। সরকারী ভবনগুলিতে সচারাচর যা হয়, পেছনের কয়েকটি জানালা বহু বছর ধরে মেরামতের অভাবে জীর্ণ হয়ে পাল্লাগুলি ঝরে গেছে। এই পথ দিয়ে বাইরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, কারণ পেছনে বহু বছরের আবর্জনা জমে পর্বতের ন্যায় উঁচু হয়ে উঠেছে। আবর্জনা ও ঢোল-কলমীর সেই জংগল সাপ-বিছার অভয়ারণ্য, দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ ঢুকে না। কোন মেয়ের পক্ষে এই নিশুতি রাতে এই পথে ভেগে যাওয়া---ভাবাই যায় না। কলোনীর চারপাশে দুর্গের মত উঁচু পাচিল। একটিই মাত্র গেট, সেখানে রাতের বেলা সংগীনধারী পাহারাদার পাহারায় থাকে। মানুষ তো আর জ্বিন না যে পলকেই উবে যাবে।

এমতবস্থায় অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে মাপ চেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসা ছাড়া আর কোন্ উপায় আছে? বিনা পয়সার মজা দেখতে যারা এতক্ষণ রাতের ঘুম হারাম করে গায়ের সাথে লেপটে ছিল, সব বেমালুম গায়েব।
এতগুলি লোককে এভাবে হতাশ করা কি মন্টুর উচিৎ কাজ হয়েছে?

(৩)

সবেমাত্র চোখদুটি লেগে এসেছে, ডোরবেলের টুংটাং শব্দে সজাগ হয়ে উঠি । ডোরবেল কৃষ্ণের বাঁশী না, রাতের বেলা সরব হয়ে উঠা এর স্বভাবের বাইরে । নিশ্চয়ই জরুরী কোন বিষয় । তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে আসি । বাইরে আমির আলী দাঁড়িয়ে, চোখে মুখে অপার উত্তেজনা ।
– স্যার, মাগীটা ধরা পড়ছে, কেলাবে বাঁইন্ধা রাখছি । তাড়াতাড়ি চলেন।
– কখন ! কোথায় ? কীভাবে ধরা পড়ল ?
সব প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করে একযোগে বেরিয়ে আসতে চাইছে । সন্ধারাতের নিস্ফলা নাটকের পর বেশ মুষড়ে পড়েছিলাম, বিষয়টি কাল ভোরে কোন মুর্তি নিয়ে দাড়ায় তা ভেবে মনে স্বস্তি ছিল না । এতক্ষণে একটা ভাল খবর পাওয়া গেল, চাংগা হয়ে উঠি ।
– তাইজ্জব কারবার স্যার, এই নিশুতি রাইতে ঢোল কলমির জংগল ভাইংগা রাজ্যের গু-মুত পারাইয়া কেমতে আইসা কেলাবের পিছে ঘাপটি মাইরা বইসা আছিল খোদায় মালুম । ভয় ডর কিচ্ছু নাই । মিয়া হোসেন চকিদার টহল মারতে গিয়া যেই না টর্চ মারছে, দ্যাখে ওয়ালের আন্ধারের সাথে মিশা কালো ভুতুমের মতো কী একটা বইসা রইছে । বাত্তি মারতেই চকচক কইরা উঠে । মিয়া হোসেনের চিক্কুইর শুইনা আমরা দৌড়াইয়া গেছি । মাগী বড় বজ্জাৎ-- ভোর হওনের লাইগা বইসা আছিল । ফজর অক্তে সবাই যখন মসজিদে ঢুকে, গেট ফাকা থাকে । সেই ফাকে ফুইটা যাওনের মতলবে আছিল । রাম ধোলাই খাইছে, অখন আপনে তাড়াতাড়ি চলেন ।

মাঝরাতে পেরিয়ে গেছে, এতরাতেও ক্লাবঘরে অনেক লোকের ভীড়। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মেয়েটি বাসী ফুলের ন্যায় বিবর্ণ। কচি মুখে বয়সের যে সাক্ষী লেপটে আছে তাতে কিছুতেই তাকে বিশের বেশী বলে মনে হয় না। এই বয়েসী একটি মেয়ের বসবাস হবে মা-বাপ-ভাই-বোনের নিরাপদ স্নেহের অতল ছায়ায়, বাতাসের শব্দেও চমকে উঠার কথা। অথচ সংসারের কোন্ জটিল আবর্ত এই নিশীথ রাতে তাকে টেনে এনেছে কামনা-লোলুপ একদংগল পুরুষের হিংস্র চোখের খোলা ময়দানে। বনের হরিনী যখন দেখতে পায় যে নিষ্ঠুর শিকারীর জাল তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে, রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই– তখন তার চোখে যে নির্লিপ্ত ভীত দৃষ্টি ফুটে উঠে, মেয়েটির দু'চোখেও অবিকল সেই দৃষ্টি। বিচারকের আসনে প্রক্সি দিতে গিয়ে সেই দৃষ্টির নীরব কান্না বাঙ্ময় হয়ে মনের পর্দায় আঘাত হানে।

হায়, এর বয়েসী যে মেয়েটি আমার ঘরে আছে সে যে এখনও সামান্য তিরস্কারেও ছলছলিয়ে উঠে, দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার বাপের গলা জড়িয়ে ধরে আদর খাওয়ার জন্যে মুখিয়ে থাকে। সমাজের নিষ্ঠুর বিচারশালা থেকে একে রক্ষা করার কোন্ উপায় আমার হাতে আছে, আমার হাত-পা সব যে সমাজের কঠিন নিয়ম শৃংখলে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

হুমায়ুনের কণ্ঠস্বরে সজাগ হয়ে উঠি।

– বল্ কোন বাসায় এসেছিলি? মার তো এখনও শুরুই হয় নাই, না বললে যখন "---" এর মধ্যে ছ্যাকা দেওয়া শুরু হবে তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল। এখনও সময় আছে, ভালয় ভালয় নাম বল্, নাম না জানলে বাসা দেখিয়ে দে।

কী জেদী মেয়েরে বাবা! এত মারধর , এত ভয় দেখানোর পরও কিছুতেই কাষ্টমারের নাম মুখে আনছে না। মন্টুকে ডেকে আনা হলো, কিন্তু মেয়ের মুখে এক কথা– সে জীবনেও তাকে দেখে নাই। লোকে যাই বলুক, এসব কেসে মেয়ে স্বীকার না গেলে কারও উপর এলজাম লাগানো ঠিক না– কেস ফেসে যায়।

আমীর আলী বলল– স্যার, মাগী বহুৎ বজ্জাৎ, ভাতারের নাম মুখে আনব না। এক কাম করেন, মাগীর চুলগুলা ছাইটা দ্যান, চুল ছাইটা মুখে চুনকালি লাগাইলেই–--

– চুপ গোলামর পুত্ গোলাম। ইস্, অখন বড় সাধু হইয়া বইছে। রোজ রোজ যখন পায়ের উপর হুমড়ী খাইয়া পইরা থাকস-তখন সাধুগিরি কই থাকে? স্যার, এই গোলামের পুতই আমারে এখানে নিয়া আইছে, আগে অর বিচার করেন।

সমস্ত সভা বজ্রাহত, আমীর আলী চুপসে গেছে। স্পষ্টতই মেয়েটি মরীয়া হয়ে উঠেছে, মরীয়া হয়ে এখন নিরাপরাধ লোককে ফাসানোর চেষ্টা করছে। আসল অপরাধীকে আড়ালে রেখে একজন নির্দোষ লোককে ফাসানোর চেষ্টায় সারা প্রাঙ্গনে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। প্রফেশনাল মেয়েরা কখনও খদ্দেরের নাম মুখে আনে না- সে চেষ্টা করে লাভ নাই। তবুও হুমায়ুন শেষ চেষ্টা করে– শোন্, মাথা ঠান্ডা কর। তোর উপর আমাদের কোন রাগ নাই, তোকে কলোনীতে কে নিয়ে এসেছে তার নামটা শুধু বল। নাম বললে তোকে এখনই ছেড়ে দেব, কেউ তোর গায়ে ফুলের টোকাও দেবে না।

– ছার, আপনাগো পায়ে ধরি আমারে ছাইড়া দেন। আমি বাজারের মাইয়া, আমারে কে আনতে যাইব, আমরা একা আসি একা যাই। আমারে যাইতে দেন ছার, জীবনে কখনও কলোনীতে ঢুকুম না– কিরা কাটতাছি। আমারে মাইরা আপনাগো কি লাভ হইব?

ঈমানদার মেয়ে, জান যাবে তবুও ব্যবসার নিয়মনীতি ভাংগবে না। কি আর করা, সমাজের ভালোমন্দের দিকটাও তো আমাদের দেখতে হবে। সুতরাং স্থির হলো, মেয়েটির মাথা মুড়িয়ে কলোনীর বার করে দেয়া হোক। একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন যা দেখে আজে বাজে মেয়েলোক কখনও এলাকার ত্রিসীমানায় ঘেষতে সাহস না পায়।

মেয়েটিকে পুলিশে হস্তান্তর করার আমার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে নাকচ হয়ে গেল। এস্থলে একটুও নমনীয় হওয়ার অবকাশ নাই, কারণ গেরস্তের ঘরগুলিকে পবিত্র রাখার গুরুদায়িত্ব যে কোন মূল্যে পালন করতেই হবে।

ধর্মনিষ্ঠ পুরুষেরা যখন পরম উল্লাসে কচি মেয়েটির রেশমী কোমল চুলের উপর নির্মম কাঁচি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল, মেয়েটির চোখের পানি উবে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে , সমাজ দারোগার কঠিন বিচারশালায় তার চোখের পানির কোন দাম নাই। তার সেই নির্লিপ্ত কঠিন মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠি। আজব কান্ড! সেই মুখে দুই হাজার বছরের প্রাচীন এক অনুক্ত ইতিহাস ছায়া ফেলে আছে। স্পষ্ট দেখতে পাই দুই হাজার বছর আগেকার বেথেলহেম নগরী। একটি খেজুর গাছের নীচে সৌম্যদর্শন যীশু কয়েকজন শিষ্য নিয়ে বসে আছেন , মুখে বিশ্বের প্রশান্তি। কয়েকজন ইহুদি এই মেয়েটিকে পাকড়াও করে নিয়ে যীশুর দরবারে হাজির।

– যীশু, এই মেয়েটি ব্যাভিচারিনী। বিচারের জন্যে একে আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। তুমি এর যথাযোগ্য দন্ডবিধান করে সমাজকে রক্ষা করো।

– তাই? বেশ ভাল কথা, তৌরাতের বিধান অনুসারেই এই অপরাধীনীর বিচার করব আমি। তৌরাতে ব্যাভিচারী নারী-পুরুষকে পাথর ছুড়ে হত্যা করার বিধান আছে, সুতরাং মেয়েটিকে মৃত্যুদন্ড দিলাম আমি। তবে তোমাদের মধ্যে যে নিস্পাপ, প্রথম পাথরটি সেই ছুড়ুক–

যীশুর রায় কার্যকর হয়নি, প্রথম পাথরটি ছুড়তে কেউ এগিয়ে আসেনি। মেয়েটি রেহাই পেয়ে গিয়েছিল, শাস্তি কার্যকর করার মতো একটি নিস্পাপ পুরুষও সেদিন খুজে পাওয়া যায়নি। এখন উল্টো কাল, পুরুষদের মধ্যে সবাই নিস্পাপ, একজনও পাপী পুরুষ সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

[রিয়াদ, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৯]

মমতার বৃত্তে বন্দী

(১)

মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে হামিদ এতিম হলো।

এই বয়সে কেউ এতিম হয় কথাটা বিশ্বাস নাও হতে পারে, তবে ঘটনা সত্য। শুধু বাপ-মা মরলেই মানুষ এতিম হয় কথাটা ঠিক না। যুবক বয়সে বউ মরলে মানুষ 'এতিমস্য এতিম' হয়ে যায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুইটা মেয়ে ও একটি ছেলে গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বউ যেদিন বিদায় নিল– সেদিন হামিদ চোখে আন্ধার দেখেছিল। সতের বছরের দাম্পত্য জীবনের মুখে লাথি মেরে ছেলেমেয়েদের মায়া কাটিয়ে একজন মানুষ এত সহজে চলে যায় ! দুনিয়াটা বড় কঠিন জায়গা। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র'– দ্বারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার––কথাগুলি তা'হলে মামূলি কথা নয়।

হামিদের দার্শনিক ভাবটা অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নাই। সংসার দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার উপযুক্ত স্থান না। পুঁই ডাটা ও কুঁচো চিংড়ির চচ্চরি এখানে এ্যারিষ্টটলের নন্দন-তত্ত্বের চাইতে বেশী গুরুত্ব পায়। নাজমা যেদিন মারা গেল, বাড়ীতে প্রলয়কান্ড চলছে। ছেলে-মেয়ে, শ্বশুর-শাশুরি, আত্বীয়-স্বজন সবাই কান্না প্রতিযোগীতায় ব্যস্ত। বিন্দুমাত্র ঢিল দিলে অন্যেরা বুঝে নেবে তার শোক অন্যের চেয়ে কম। সুতরাং সবাই এক নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছে। হামিদের শোক যে কিছু কম হচ্ছিল তা নয়, তবে কান্নায় মেয়েদের সাথে পাল্লা দেয়া আর যাই হোক পুরুষের পক্ষে সম্ভব না। স্বামী মারা গেলে বউরা সুর করে কাঁদবে এটাই রীতি। বউ মারা গেলে স্বামী হাপুস নয়নে কাঁদছে- দৃশ্যটা বড়ই দৃষ্টিকটু। সুতরাং হামিদ চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ রাত দুইটায় পাকস্থলী বাগড়া দিয়ে বসল– প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। এই কঠিন সময়েও ক্ষুধা পায়, এই জ্ঞান হামিদের ছিল না। লজ্জায় কথাটা কারও কাছে বলতে পারে নাই, তবে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল– শরীরের দাবী কোন অবস্থায় থেমে থাকে না।

বউ মারা যাওয়ার পর মাস ছয়েকের মধ্যেই হামিদের সংসার লন্ডভন্ড। মেয়েরা সব স্কুল কলেজের ছাত্রী। সংসারই বা দেখে কে আর কোলের ছেলেটাকেই বা কে সামলায় ? এমতবস্থায় বান্ধব-সুহৃদরা সক্রিয় হয়ে উঠবে- এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে হামিদের মাথার একটা চুলও পাকে নাই, শরীরে থই থই যৌবন। প্রকাশ না করলেও হামিদ মনে মনে খুব খুশী। বাংলাদেশের এতগুলি কুমারী মেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, হু করলেই পায়ে এসে হুমড়ী খেয়ে পড়বে– ভাবতেও রোমাঞ্চ। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাইলে একটু অপরাধবোধ মনে জাগে ; সৎ মায়ের আসন্ন আবির্ভাবে সেগুলি শুকনা মুখে করে ঘুরে বেড়ায়।

অযথা চিন্তা, সব সৎ মা'ই কি আর অসৎ হয় ? সৎ মায়েরা সৎ হতে পারবে না হাদিস-কোরাণে এমন কোন বিধান লেখা নাই।

কোলের ছেলেটা হামিদের বড়োই ন্যাওটা, মা মারা যাওয়ার পর বাপকেই পরম নির্ভরস্থল হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। হাত দু'টি ছোট ছোট, কিন্তু টান বড় তীব্র। সেদিন রাতে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বলে– 'বাবা, তুমি আলেকটা বিয়া কলবা' ?

ছেলে সবেমাত্র পাঁচে পা দিয়েছে, মুখে এখনও র' ফুটে নাই। এতটুকুন ছেলের মুখে এই প্রশ্ন শুনে হামিদ থতমত খেয়ে যায়, কি জবাব দেবে ভেবে উঠতে পারে না। অবশেষে ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে– 'হ্যা বাবা। তোমার একটা মায়ের দরকার আছে না ? আমরা যখন বাসায় থাকি না তোমার একা একা কত কষ্ট হয়। নতুন মা তোমারে কত আদর করবে, কোলে নিবে---'।

হামিদ কথা শেষ করতে পারে না, ধাক্কা মেরে বাপের হাতটা সরিয়ে দেয় ছেলে। মুখে রাজ্যের অভিমান। তারপর বলে– 'আদল কলব না ছাই, আমালে গলা তিপা মেলে ফেলবে' ?

এইটুকুন ছেলের মুখে এই কথা ! বুঝতে পারে- বড় বোনেরা ভাইকে যা টিপে দিয়েছে অবোধ শিশু তোতা পাখীর মত তাই আউড়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের মনে তার বিয়ে নিয়ে কী পরিমান শংকা কী পরিমান দূশ্চিন্তা বিরাজ করছে, তা ভেবে স্তব্দ হয়ে যায় হামিদ। এরা মাকে হারিয়েছে, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর উপর বাপ হয়ে সে তাদের উপর সৎ মায়ের বিভীষিকা চাপিয়ে দিতে যাচ্ছে। আত্মসুখ পৃথিবীতে এতই জরুরী ? তার জন্যে মায়ের কোল হারিয়ে বাপের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসা একটি শিশুকেও বিমুখ করা যায় ?

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে হামিদ। শপথ নেয়– যে যাই বলুক আর সে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিড়িতে বসছে না। ছেলেমেয়েদের জন্যে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে না পারলে নিজের কাছে বড়োই অপরাধী হয়ে থাকতে হবে তাকে।

(২)

ছোট শালী জোবেদী মা মরা 'বইনপো-বইনঝি'গুলির প্রতি বড়োই যত্নশীল। বড়বোনের সংসারটা যাতে রক্ষা পায়, মান-সম্মান ইজ্জত-হুরমত নিয়ে সমাজে টিকে থাকতে পারে সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। একটা মনের মত কাজের মেয়ে যোগাড় করতে এ যাবৎ সে প্রায় ডজনখানেক 'বুয়া সাপ্লাইয়ার' মহিলাকে আগাম দাদন দিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে সে খুবই সতর্ক, সামান্যতম ভুল হলে সমাজে মুখ পুড়বে। এমন একজন মহিলা যোগাড় করতে হবে যার গায়ে গত্তি আছে, অথচ পুরুষের মন টানে না। ঘি জমে ক্ষীর হয়ে গেলেও আগুনের কাছে নিলে একদিন না একদিন তা গলবেই– এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। বিশেষ করে দূলাভাই এখনও হদ্দ জোয়ান।

অবশেষে একদিন হাসিমুখে দুলাভাইর বাসায় হাজির হয় জোবেদী। একজন মাঝবয়েসী জবুথবু মহিলাকে টানতে টানতে হামিদের সামনে হাজির করে।

-'সালাম কর, সালাম কর। বাপের মত মান্যি করবি, আব্বা বলে ডাকবি'।

আবক্ষ ঘোমটা দেয়া মুর্তি সসংকোচে সালাম করে হামিদকে। বয়স বুঝা যায় না, তিরিশও হতে পারে পঞ্চাশ হওয়াও বিচিত্র নয়। মহিলার পিছে আরও দুইজন, সম্ভবত মহিলার ছেলেমেয়ে। ছেলেটির বয়স দশটশ হবে, মেয়েটির পনের।

সালাম পর্ব শেষ করে মহিলা বেরিয়ে গেলে হামিদ প্রশ্ন করে- 'এই বুড়িটাকে কই থেকে জুটালি ' ?

-'ছিঃ দুলাভাই, বুড়ি হবে কেন ? গরীব মানুষ, ভালমত খেতে পড়তে পায় না তাই অমন বুড়ি বুড়ি লাগছে। বয়স পয়তিরিশের বেশী হবে না। দেখলেন না, রানু নামের যে মেয়েটি ওটিই প্রথম সন্তান। রানুর বয়স পনেরর বেশী না, মায়ের বয়স আর কত হবে। তাছাড়া কাঁচা বয়েসের মেয়ে আপনার বাসায় দেয়া যাবে না– অসুবিধা আছে'।

-'কি অসুবিধা, আমি খেয়ে ফেলব' ?

-'বিশ্বাস কী ? পুরুষ মানুষেরে আমি আধা পয়সা দিয়াও বিশ্বাস করি না'।

-'বলিস কি রে, কয়টা পুরুষ দেখেছিস ? নাকি টেপা মিয়াই কোন দাগা টাগা দিছে'?

জোবেদীর স্বামী মোশারফ তালুকদার ব্যাংকের বড় অফিসার। মানুষটি লম্বায় কিছু খাটো হলেও পাশে পুষিয়ে নিয়েছে– ফুটকা মাছের সাইজ। সুতরাং শালাশালী মহলে টেপা নামে সুপরিচিত।

-'ইশ্, বুলির বাপ বুঝি আপনার মত ? বেগানা মাইয়া মানুষের দিকে ফিরেও চায় না– তা জানেন' ?

-'জানতাম না, এখন জানলাম। তা আমি আবার কোন্‌দিন তোর বুজি ছাড়া অন্য মাইয়া মানুষের দিকে চোখ দিলাম যে রাজ্যের বুড়ি টুরি এনে গোয়াল ভরছিস্' ?

-'আহ্ দুলাভাই, বারবার বুড়ি বইলেন না তো। বাসায় চোখে রাখার মত কেউ নাই, পনের বছরের ছুড়ি দেই আর কেয়া ভাবীর কেচ্ছা ঘটুক'।

জোবেদীর কেয়া ভাবী বিখ্যাত মহিলা, তার দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। চোখ যেন শকুনের চোখ, সেই চোখকে ফাকি দিয়ে কেউ বেচাল করবে এমন বুকের পাটা কার আছে ? বাসায় কাজ করার জন্যে উঠতি বয়েসের মেয়ে রাখা কেয়া ভাবীর জন্যে কোন ব্যাপারই না। এহেন ভাবীর সংসারে একবার তূলকালাম কান্ড ঘটে গেল। শমলা বার বছর বয়সে ভাবীর কাছে এসেছিল, তিন বছর ঘর করার পর এখন পনেরয় পা দিয়েছে– কোন সমস্যা হয় নাই। হঠাৎ একদিন রাতের বেলা শমলার আর্তচীৎকারে গোটা মহল্লা সচকিত। বিষয়টা কী ? কেয়া ভাবীর সংসার ষ্টেট ব্যাংকের ভল্টের মতই নিচ্ছিদ্র, কোন গুহ্য কথা সেখান থেকে বাইরে আলোর মুখ দেখবে সে জো নাই।

অথচ কথাটা এমনই পিছলা যে ভোর না হতেই সারা মহল্লায় রাষ্ট্র হয়ে গেল– শমলার বিছানার তলা থেকে ভাবী আঁধ খাওয়া এক পাতা পিল আবিস্কার করেছেন ! সেই থেকে জোবেদী এ বিষয়ে বড়ই সতর্ক হয়ে গেছে।

সুতরাং জোবেদীর বিস্তর পরামর্শ ও সদুপদেশ মাথায় নিয়ে রানুর মা হামিদের সংসারের চার্জ বুঝে নিল। তার ছেলে মেয়ে দু'টিকে আত্মীয় স্বজনরা ভাগযোগ করে নিয়ে নিল, রানুর মা 'একমেবাদ্বিতীয়ম' হয়ে হামিদের সংসারে গেড়ে বসল।

হামিদ শীঘ্রই আবিস্কার করল- বিষয়টা খারাপ হয় নাই। সদ্য গাব খাওয়া নাও নয়া পানিতে তরতর করে এগিয়ে যায়, হামিদের সংসারটাও হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে দিব্বি গড়গড় করে এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের স্কুল-কলেজের কোন ব্যাঘাত ঘটছে না, বাসা ফিটফাট থাকছে। এমনকি সময়মত গরম ভাতের সাথে নলা মাছের ঝোল পর্য্যন্ত কপালে জুটে। ছেলেটা মা মারা যাওয়ার পর কেবলই শুকিয়ে যাচ্ছিল। হামিদের পুরুষালি যত্ন-আত্তির ঠেলায় তার চেহারা আরও বেশী করে কাকলাশের মত কংকালসার হয়ে যাচ্ছিল। রানুর মা দায়িত্ব নেয়ার পর তার মাঝেও স্বাস্থ্যের ঝিলিক লক্ষ্য করা যায়। অবাক কান্ড।

সারারাত অফিসে যন্ত্রের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে বাসায় ফিরেছে হামিদ। চোখ দু'টি লেগে এসেছে কি লাগে নাই, চীৎকার চেচামেচিতে সচকিত হয়ে উঠে সে। বিষয়টা কী ? রান্নাঘরে উকি দিয়ে দেখে– হুলস্থুল কান্ড। পাপু চুলের মুঠি ধরে রানুর মাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলেছে আর পিঠে দমাদম কিল মারছে। ছোট মেয়ে অর্চি বোধ হয় সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরল। সে ভাইকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে–'ছাড়লি। ইস্, চুলগুলা উঠে যাবে যে---'।

কালো কুঁচকুঁচে একমাথা চুল। হামিদের বুকটা চিড়িক খেয়ে গেল। মারা যাওয়ার সময় পাপুর আম্মার মাথাভর্তি এইরূপ একরাশ কালো কুঁচকুঁচে চুল ছিল।

সে ধমক মেরে বলে–'এ্যাই পাপু। কী হয়েছে, ছাড়লি '।

চকিতে উঠে দাড়ায় রানুর মা। বুকে মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে কোনের দিকে সরে যায়। অর্চি ঝংকার দিয়ে উঠে– 'হবে আবার কী ? আপনার পোলা বড় হলে একটা আস্ত ডাকাত হবে। আর তোমারেও কই রানুর মা, দোষ তোমারই। বড়'পা কতবার বলেছে- কোলে নিয়ে খাইয়ে দিলে পোলাপানের অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। তুমি শুনবা না। ভার্সিটি থেকে ফিরুক, আমি বড়'পাকে সব বলে দেব। কুহুরা দিয়া তুমিই ওর মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছ'।

শান্ত বিকেল। পুব দিকের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে সুচি শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট পড়ছিল। সে জাহাংগীরনগরে ইংরেজীতে অনার্স করছে। সামনের খালি জায়গাটাতে ফুল ও সবজীর বাগান করেছে হামিদ। রানুর মা একটা ঝারি দিয়ে চাড়াগাছের গোড়ায় পানি দিচ্ছিল।

পাপু তার পায়ে পায়ে ঘুরছে। ছোট্ট একটা শামুকের খোসা কুড়িয়ে নিয়ে সে বলল- 'এতা কী, আনুম্মা' ?

-'ফেইলা দাও ফেইলা দাও। ওডা জোকের কৌটা, হাত কাইটা যাইব'।

-'না ফেলমু না। জোকের কৌতা কি' ?

সুচি বারান্দা হাত ডাকল- 'রানুর মা, এদিকে আস তো'।

রানুর মা বারান্দায় আসে। সুচি বলে- 'বাচ্চাদের কাছে মিছা কথা বলতে নাই। ওদের কাছে সবসময় সত্য কথাটা বলতে হয়'।

রানুর মা অবাক হয়ে বলে-'কি কইন আপা, আমি মিছা কথা কইলাম কখন' !

-'বললে না। শামুকেরে বললে জোকের কৌটা। এখন যাও, আব্বার কাপড় চোপড়গুলি আয়রণ করে রাখ'।

রানুর মা ভেতরে চলে যায় এবং সাথে সাথেই ফিরে আসে। হাতে একটা চিরুণী। সুচিকে বলে-'মাথাডা সোজা করেন তো আপা, চুলগুলা আচড়াইয়া দেই। আত সুন্দর চুল, কাউয়ার বাসা হইয়া রইছে'।

-'তুমি আমার চুলের পেছনে লাগলে কেন ? তোমারে না কাপড় আয়রণ করতে বললাম'।

-'হে চিন্তা আপনের করণ লাগত না আপা। কয়ডা মাত্র কাপড়, দুপুরেই ডলা দিয়া আলমারীতে তুইলা রাখছি'।

যত্ন করে সুচির জট ছাড়াচ্ছে রানুর মা। এত সাবধানে চিরুণী চালাচ্ছে যে সুচির ঘুম পেয়ে যায়। রানুর মা বলে- 'আপা, চান্দিতে একটু তেল ডইলা দেই, আরাম লাগব নি' ?

-'খবরদার। তেল দিলে মাথা স্যাৎস্যাতে হয়ে যায়। যা করছ কর, মাতাব্বরী করতে হবে না'।

কিছুক্ষণ পরে রানুর মা আবার বলে- 'আপা, বনপুকুরে আপনাগো যে জমিডা আছে, সেখানে আব্বাকে একটা ঘর তুলতে বলেন না। এইটুক্ ফেলাটে পাপু খাঁচায় বন্দী হইয়া থাকে, দৌড়ঝাপ করতে পারে না'।

সুচি বলে- 'ঘর তুলতে কত টাকা লাগে জান ? আব্বার কাছে এখন টাকা নাই'।

রানুর মা বলে- 'কর্জ কইরা তুলুক আপা। সেখানে গেলে আমি হাস-মুর্গী পালুম, গাই পালুম। আব্বার আর দুধ-মাংসের পিছে টাকা খরচ করতে হইব না। মাসে মাসে ফেলাটের ভাড়া টানন লাগব না। দেখবেন, এক বছরেই আব্বার সব টাকা উইঠা আইব'।

সুচির মুখ কোমল হাসিতে ভরে যায়। বলে- 'আব্বার টাকা বাচানোর জন্যে তোমার দেখছি চোখে ঘুম নাই। ঠিক আছে, আব্বাকে আমি বলব– আব্বা, রানুর মা'র বুদ্ধিমত চলেন। দেখবেন, একবছরেই আপনি বড়লোক হয়ে গেছেন। বলব' ?

মুখে কোন কথা নাই রানুর মা'র- লজ্জায় মাথা নীচু করে আছে সে।

সুচি স্নিগ্ধস্বরে বলল- 'খালাম্মা তোমাকে মাসে মাসে তিন শ' টাকা করে বেতন দিতে বলেছিল। ছয়মাস হয়ে গেল তুমি একপয়সাও নিচ্ছ না।

আব্বার যা টানাটানি, তোমার টাকাগুলি খরচ করে ফেলবে– দরকারের সময় দিতে পারবে না। দেশে কি তোমার কেউ নাই যে টাকাগুলি দিয়ে তোমাকে একট জমিটমি বন্ধক রেখে দিতে পারে' ?

রানুর মা জিভ কেটে বলল- 'ছি ছি, কী যে কন আপা ! আব্বা ফেরেশতার মত মানুষ। হে আমার টাকা খরচ কইরা ফেলব, আমারে কাইটা ফেললেও বিশ্বাস করুম না। যদি রাগ না করেন তো আপনেরে একটা কথা কই আপা'।

-'বলো'।

-'আপা। দুই দুইটা বাচ্চা নিয়া আমি অকূল সাগরে ভাসছিলাম। আব্বা আমারে পায়ে ঠাই দিছে, আমার বাচ্চাগুলার ব্যবস্তা কইরা দিছে। আমারে বেতনের কথা কইয়া শরম দিয়েন না আপা '।

সুচি আশ্চর্য্য হয়ে বলল- 'সেকি, তুমি বেতন ছাড়াই কাজ করবা নাকি' ?

রানুর মা বলল- 'টাকা পয়সা দিয়া আমি কী করুম ? আব্বারে কইয়েন– আমার জাহাংগীর বড় হইলে তিনায় যেন তারে একটা চাকরির ব্যবস্তা কইরা দেয়। আমি সারাজীবন আপনাগো বাসায় বিনা পয়সার বান্দী হইয়াই থাকুম গো আপা, পাপুরে ছাইড়া আমি কোনদিন যামু না-----'।

(৩)

বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন- মানুষের মৌলিক চাহিদা নাকি চারটি– অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষা। বিশেষজ্ঞদের বাক্য যে আসলেই বেদবাক্য- রানুর মা'র পরিবর্তন দেখে তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। দুইবেলা পেট পুরে খেয়ে এবং একটি নিরাপদ ছাদের তলায় ঘুমিয়ে তার চেহারার এমন রূপান্তর হয়েছে যে ছয়মাস আগের রানুর মা'র সাথে বর্তমান রানুর মা'র বিন্দুমাত্র মিল নাই। বয়সটা যেন এক লাফে দশ বছর কমে গেছে। রোদে পোড়া ঘামে ভেজা তামা রং ঘুচে গিয়ে সেখানে এখন কাঁচা সোনার রং। মাংসের অভাবে আগে দেহটা ছিল সরলরেখার মত সোজা। প্রচুর শারিরিক পরিশ্রমের সাথে পরিমিত ক্যালরি যোগ হয়ে এখন সেখানে মাংসপিন্ড এমন সুষমভাবে বেড়ে উঠেছে যে শরীরের খাজ-ভাজগুলি মারাত্মকভাবে চোখে পড়ে। চোখ দু'টি আগে ছিল মরা মাছের মতো ভাবলেশহীন। এখন সেখানে হাসিখুশীর বিভিন্ন ভাব বিদ্যুতের মত ঝিলিক মারে। পরিণত-যৌবনা হরিণীর কাঁচা মাংস বাঘের প্রিয় খাদ্য। অধিকাংশ পুরুষের মাঝে নারী মাংসলোভী একটি করে বাঘ লুকিয়ে থাকে। তাদের চোখে রানুর মা একটি চিত্রল হরিণ বিশেষ– পাশের বাসার ঠিকে ঝি খুরমন বিবি এই সত্যটি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে।

ঝি হিসেবে কাজ করার দীর্ঘকালের এক্সপেরিয়েন্স খুরমনের।

কোন বৈধ কমিশনের আন্ডারে নির্বাচিত না হলেও সেইই মহল্লার ঝি-সমিতির অনারারী চেয়ার পার্সন। তার পরামর্শে বুয়া সমাজের সকলেই কমবেশী উপকৃত, সুতরাং সকলেই তার কথা মোটামোটি মেনে চলে।

সেদিন দুপুরে বাসা ফাঁকা, খুরমন বাসায় ঢুকল- 'রানুর মা কই লো। বাসা দেখছি ফাঁকা। পান খাওয়া, তর হাতের পান খাইতে আসলাম'।

রানুর মা পাকের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। সে লজ্জিতভাবে বলল- 'বসেন বুজি। এ বাসায় তো কেউ পান খায় না, আমি আপনেরে পান দেই কই থেইকা ? চা খাবেন, চা বানাইয়া দেই' ?

খুরমন খুশী হয়ে বলল- 'জানি। আমি সব খবর রাখি। এই নে, আমিই তর জন্য পান নিয়া আসছি'। বলে আঁচলের খুট খুলে পানের পুরিয়া বের করতে থাকে খুরমন।

-'তারপর। খবর টবর কি, সাহেব ঠিকমত আদর যত্ন করে তো' ? খুরমনের প্রশ্ন।

রানুর মা সরলভাবে বলে- 'খুব আদর করে বুজি। আমার 'পরে বাসার সকল দায়িত্ব ছাইরা দিছে। খুউব বিশ্বাস করে আমারে'।

খুরমন বলল- 'ভাল কথা। এখনই তো সময়। হাতের মুঠায় থাকতে থাকতে যা পারস গুছাইয়া নে। পারলে কিছু গয়না-গাট্টি আদায় কর– মেয়ের বিয়ায় কাজে লাগব'।

খুরমনের কথা রানুর মা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না, তার মুখের দিকে হাবার মত চেয়ে থাকে।

খুরমন আরও ঘনিষ্ট হয়। ফিসফিস করে বলে- 'সাবধানে কাজ-কাম করবি, সাহেবের মাইয়ারা যেন টের না পায়। বড় মাইয়া যা দারগা, বিন্দুমাত্র টের পাইলে তরে কাঁচা খাইয়া ফেলব। বাঁধিয়ে বসলে খবর আছে। কী ব্যবহার করস, বড়ি না টুপী'?

খুরমনের কথার গুঢ় অর্থ এইবার বুঝতে পারে রানুর মা। মনে হয় তার কান দু'টিতে কেউ যেন ছ্যাকা দিয়েছে। লোভী চকচকে পংকিল দু'টি চোখ তার দিকে সাপের মত চেয়ে আছে। নিদারূন অপমান ও অসহ্য কষ্ট তার গলা চিড়ে আগ্নেয়গিরির আগুনের মত বেরিয়ে আসে- 'যান্ । এ্যাক্খুনি বাইরাইয়া যান। আর কোন দিন এই বাসায় ঢুকবেন না। ছি ছি ছি। একজন ফেরেশতার মত মানুষ, আমারে মাইয়ার মত দেখে। তারে নিয়া এইসমস্ত নোংরা কথা বলার আগে আপনের জিবলা খইসা পড়ল না ক্যান্'?

খুরমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। এসমস্ত ব্যাপারে সে বহুবার অযাচিত হস্তক্ষেপ করেছে, তার মুল্যবান উপদেশের বিনিময় বাবদ পুরস্কৃতও হয়েছে নানাভাবে। কখনও এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সন্মুখীন হতে হয় নাই তাকে। মেজাজটাই খাট্টা হয়ে যায় তার। ভেতরের সবটুকু বিষ ঢেলে দিয়ে সে বলতে থাকে– 'দেখছি লো দেখছি। ওরকম ঢং বহুৎ দেখছি।

তুই ঢাইকা রাখলে কী হইব, দেশে বুঝি মানুষ নাই, তাগো চোখ বুঝি সব কানা? আইছিলি তো বাঁশের খাবাই, অখন সেই মরা বাঁশে ফুল ফুটেছে। পুরুষ মানুষের সোহাগ না পাইলে গতর ফুইলা অমন কলাগাছ হয়? আমরা কিছু বুঝি না মনে করছস্----'?
রানুর মা'র জ্বলন্ত চোখের দিকে চোখ পড়তে কথা বন্ধ হয়ে যায় খুরমনের, তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ করে সে। যুদ্ধে জয়ী হতে হলে সময়মত কৌশলগত পশ্চাৎপসরণ করতে হয়– এই টেকনিক তার ভালই জানা আছে।

ছালেহ্ হুজুরের দোকান মহল্লার এক ইম্পর্ট্যান্ট জায়গা। মুদী দোকানের সাথে চায়ের বন্দোবস্ত রাখাতে এটি একটি আদর্শ আড্ডাস্থল হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাসার জন্যে প্রয়োজনীয় সদাই কিনতে রানুর মাকে প্রায়ই সেখানে যেতে হয়। তাকে দেখে আড্ডারত একজন বলল- 'এটা হামিদ মিয়ার দিলকা রানী সেই মাগীটা না? বাহ্, খাসা মাল রে দোস্ত । মিয়ার কপাল ভাল। সাধে কি আর লোকে বলে- কপাইলার বউ মরে, অভাগার মরে গরু'।
-'চুপ্ রফিক্যা। আস্তে ক' শুনতে পাবে। হামিদ সাবের কানে গেলে মুশকিলে পড়বি'।
রফিক বলল- 'ক্যান্, আস্তে কমু ক্যান্? কারও বাবার জমিদারিতে থাকি নাকি যে হাচা কথা কইতে ডরাইতে হবে'?
-'কোনটা হাচা কথা আর কোনটা মিছা কথা তুই জানলি কী করে'?
-'কোনটা হাচা আর কোনটা মিছা তা আমিও জানি তুইও জানস। আমি তোর মত ডরপুক না যে সব জেনেশুনেও মুখ বুজে থাকব। সেদিন হামিদ মিয়া রাজধানী ক্লিনিকে পিটি করাতে গিয়েছিল। শান্ত রাজধানীতে টেকনিশিয়ানের কাজ করে, আমাকে সব বলেছে। আঁধ-বয়েসী লোক, ঘরে বউ নাই। সেই লোক কার মুত্ নিয়া ক্লিনিকে ক্লিনিকে দৌড়াদৌড়ি করে তুইই বল? মহল্লার কোন লোকটা এই কেচ্ছা না জানে? ছি ছি ছি, ঘরে দুই দুইটা বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। সেই লোক এমন নোংরামী করলে সহ্য হয় বল্'?

(৪)

কলেজ জীবনের পুরাতন বন্ধু-বান্ধবীদের খোজ করতে ক্যাম্পাসে ঢুকেছিল মাহি। ইন্টার পাশ দিয়েই সেনাবাহিনীতে ঢুকে যায় সে। ক্যাপ্টেন হওয়ার পর পদের সাথে তার নামেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কলেজের সেই লাজুক মহিউদ্দিন এখন মাহি। ক্যাপ্টেন মাহি। কলেজে পড়ার সময় সুচি ছিল তার স্বপ্নের নায়িকা। সুচিকে এক তরফাভাবে ভালবেসে গেছে সে, একান্ত সংগোপনে মনের গহীনে প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে গেছে। মনের কথাটি কখনও মুখ ফুটে বলা হয়ে উঠেনি।
পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের খোজখবর করতেই তার ক্যাম্পাসে আসা– এটা বাহ্য কারণ। বহুদিন পরে সুচিকে দেখা, তার সাথে বসে কিছুটা সময় কাটানো– মনের গোপনে লালন করা এইরূপ একটি আশাই তাকে এত পথ তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

কম দূর তো নয়, সেই বান্দরবন থেকে রাজধানী ঢাকা।

এখন শীতকাল। উত্তুরে হিমেল বাতাসের তীব্র আক্রমণের মুখে সূর্য্যের উত্তাপ বড় মোলায়েম হাতে মানুষের দেহ-মনে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সামনের লনে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে রৌদ্রের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছে। একটি মেয়ে মাহিকে দেখে বাঁশীর মত বেজে উঠল- 'আরে মহি! স্বপ্ন দেখছি নাতো? বেকার ফ্যাক্টরিতে বাংলাদেশের একজন ভাবী প্রেসিডেন্টর পদধূলি'!

মাহি বলল- 'ঢাকা এসেছিলাম। ভাবলাম তোদের খোজখবর নিয়ে যাই। আছিস কেমন, তুই যেন কোন সাবজেক্টে উর্মি'?

উর্মি বলল- 'বেকার ফ্যাক্টরির সবচেয়ে উচা সাবজেক্ট– জিয়গ্রাফি। ক্লাশটাশের বালাই নাই, ক্যাম্পাসে আসি বর খুজতে। ঐ যে তোদের রবী ঠাকুরের কী জানি একটা গান আছে না– পথে পথে মোর ঠাই আছে আমি সেই ঠাই মরি খুঁজিয়া, ঘরে ঘরে মোর বর আছে আমি সেই বর লব যুঝিয়া'। বলতে বলতে খিল খিল করে হেসে ভেংগে পড়ে উর্মি।

মাহি বলল- 'তুই এখনও সেই একই রকম ফাজিল রয়ে গেছিস উর্মি, একটুও বদলাসনি। ফাজলামি রাখ, তোর বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিবি না'?

-'সরি। এরা হচ্ছে আমার ক্লাশমেট সুমনা আর বীথি। আর এ আমার কলেজের বন্ধু মহি, থুক্কু ক্যাপ্টেন মাহি'।

কুশল বিনিময়ের পর কিছুক্ষন মামুলি কথাবার্তা। এক সুযোগে মাহি বলল- 'আচ্ছা সুচি কোথায় রে, সে না শুনেছিলাম ইংলিশে পড়ে'?

উর্মি বলল- 'সুচি? ওহো, তুই নিদ্রারাণীর কথা বলছিস? দেখ গিয়ে, এখনও হয়তো পড়ে পড়ে বিছানায় ওম্ দিচ্ছে। বাব্বাহ্, মানুষ এত ঘুমোতেও পারে? ঘুমের জন্যেই দেখবি একদিন ওর নাম গিনেস বুকে উঠে গেছে'।

মাহি বলল- 'আরে ধ্যুৎ। আমি এইমাত্র কলেজ রোড হয়ে আসলাম। ওদের বাসায় নক করেছিলাম। ওর মা বলল- ক্লাশে গেছে'।

-'তুই কী বলছিস রে মহি! মাথা ঠিক আছে তো? আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল সুচির মা মারা গেছে'!

মাহি আশ্চর্য্য হয়ে বলল- 'তুই বলিস কি উর্মি, সুচির মা মারা গেছে ! ফর্সামত মহিলাটা তা'হলে কে, সুচির ছোট ভাইটা আম্মু বলে ডাকল ! সুচির আব্বা কি আবার বিয়ে করেছে'? মাহির কথায় উর্মিও কম আশ্চর্য্য হয় না। সুচির সাথে যথেষ্ট ঘনিষ্টতা তার, খালুজান আবার বিয়ে করলে অন্ততঃ তার তো জানার কথা।

এমন সময় দেখা গেল- খুব জোরে একটা রিক্সা আসছে। সেদিকে তাকাতেই মাহির কলজেটা নেচে উঠল। সুচি------।

বাসার আবহাওয়া ক্রমেই কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠছে। চারপাশে একটা কালো মেঘের ঘনঘটা টের পায় রানুর মা। একটা দূর্ভাগ্য যেন আবার তাকে গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। বাসার কেউ আর তার সাথে স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলে না, কী এক অদৃশ্য বাধা লুকিয়ে আছে সবার মনে। জবাবদিহীতার সুযোগ না দিয়েই তার শাস্তির ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ফেলল সবাই? ব্যাতিক্রম শুধু এক পাপু। সমাজের কালো ছায়াটি শুধু তার মনটাকেই আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বরং দিন দিন আরও বেশী ন্যাওটা হয়ে যাচ্ছে তার। জোর করে নাইয়ে দিতে হবে, মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হবে, কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। একটু এদিক ওদিক হলে সর্বনাশ– কেঁদেকেটে, আঁচড়ে কামড়ে সবকিছু ছত্রনাশ করে ফেলবে।

কাল রাতের ঘটনা। মেঝেতে বসে একটা কাথা সেলাই করছিল রানুর মা। পাপু পাশে বসে খেলছে, রেলগাড়ীর খেলা। পাশের ঘর হতে হামিদ ডাকল- 'পাপু। রাত হয়েছে, শোবে এস'।

পাপু বলল- 'তুমি শোও আব্বা। আমি আনুম্মা'ল ছাতে শুই- হ্যা'।

রানুর মা বলল- 'যাও সোনা। আব্বা একলা একলা ভয় পাবে'।

পাপু জেদের স্বরে বলল- 'না, তাইলে তুমিও চল, আমাদেল ছাতে ঘুমাবে'।

মা'হারা এই অবোধ শিশুটিকে এখন কীভাবে সামলায় সে ? পাপুকে ছেড়ে তাকে চলে যেতে হতে পারে একথা ভাবলেও দম বন্ধ হয়ে আসে তার।

দুপুরে বাসায় ফিরতেই পাপু দৌড়ে এসে নালিশ দিল- 'আব্বা, খালাম্মা আনুম্মাকে মালছে'।

বাসা সুনসান। পাশের রুম হতে জোবেদীর নীচু গলার কথা শোনা যায়। সরাসরি নিজের রুমে ঢুকে যায় হামিদ।

অর্চি ডাকল- 'আব্বা আসেন, টেবিলে খানা দেয়া হয়েছে'।

খানার টেবিলে সবাই বসে আছে। জোবেদী বলল- 'আজ এত দেরী করে ফিরলেন যে দুলাভাই? আমি সেই কখন এসে বসে আছি'।

-'টেলিফোন করলেই পারতি, চলে আসতাম'।

জোবেদী আর কিছু বলছে না, একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

অবশেষে জোবেদী বলল- 'আমি রানুর মা'কে নিয়ে যেতে এসেছি'।

-'বেশ তো, নিয়ে যাবি'।

-'কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। কেঁদে কেটে একসা। ষ্টোর রুমে খিল এটে বসে আছে'।

হামিদ কোন জবাব করে না, এক মনে খেয়ে যাচ্ছে।

সুচি বলল- 'যাবে না মানে, ওর ঘাড় যাবে। মাগীর চুল ধরে টেনে নিয়ে যান খালাম্মা'।

খাওয়া ফেলে উঠে যায় হামিদ, তীব্রদৃষ্টিতে একবারমাত্র তাকায় মেয়ের দিকে।

(৫)

মতি মিয়ার বস্তিতে চমৎকার একটা চৌচালা টিনের ঘর। চারিদিকে গাছ-গাছড়া। এটা জাহাংগীর মিয়ার বাড়ী। জাহাংগীরের মা হনুফা বেগম একজন প্রফেশনাল ঝি ছিল। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ঝি-গিরি করে সে জাহাংগীরকে একটা দোকান করে দিয়েছিল। সেই দোকান থেকে আজ তার একটা বাড়ী হয়েছে।

ঘরের ভেতর হতে কাপা কাপা গলা শোনা গেল- 'কই গেলা বউ। অপু ঘুমাইয়া পড়ছে, অরে চৌকিতে নিয়া শুয়াইয়া দেও'।

বউয়ের দেখা নাই। বাকানো শরীরটা কোনমতে সোজা করে নিজেই নাতিকে শুইয়ে দেয়ার যোগাড় করে বুড়ি। ইস্, একরাশ ফুলের মত নেতিয়ে আছে ছেলেটি। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে এক সমুদ্র স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠে বুড়ির বুকে। ঝাপসা চোখে সমুদ্রের লোনা জল। নীচু হয়ে ছেলের কপালে চুমো এঁকে দেয় বুড়ি। বিড় বিড় করে বলে- 'পাপু, সোনা মনি আমার---------'।

রিয়াদ,
৪ঠা আগষ্ট, ২০০২ সাল।

সুপ্রিয় পাঠক

আমাদের এই প্রকাশনা সম্পর্কে সুপ্রিয় পাঠকদের মতামত চাই।
আপনাদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতেই আমরা আমাদের আগামী প্রকাশনার ডালি সাজাবো।

Email: marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com